প্রকাশক—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার শীল
শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী
২১১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ

প্রিণ্টার—শ্রীপঞ্চানন দাস
সত্যনারায়ণ প্রেস
২৫ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

গোড়ার কথা

ফুটবল-খেলা শেষ হ'ল। খেলার মাঠে ব'সে আমরা কয়-বন্ধুতে মিলে একটু জিরিয়ে নিচ্ছি। কারণ খেলোয়াড়দের চেয়ে, এ-খেলা যারা দেখে, তাদেরও খাটুনি বড় কম হয় না।

প্রথমে টিকিট কিনতেই তো জনতার ধাক্কায়, আর কনুইয়ের গুঁতোয় জান হয় হায়রাণ, গতর যায় থেঁত হয়ে; তারপর খেলা সুরু হবার আগে ঘণ্টা দুই-তিন ধ'রে রোদে ব'সে তেষ্টায় কাঠ হ'য়ে অপেক্ষা;—তারপর খেলার সময়ে উত্তেজিত হয়ে ষাঁড়ের মতন চীৎকার করা আর পাগলের মতন হাত-পা ছোঁড়া এবং মাঝে মাঝে গ্যালারি ভেঙে হুড়মুড় ক'রে 'পপাত ধরণীতলে' হওয়া!—এর পরেও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম না করলে চলবে কেন?

'মোহন-বাগান' যে দিন জেতে সেদিন সব কষ্টই উৎসাহ আর

বিজয়া

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় -

বিজয়া দশমী—১৩৩৬

আনন্দের ভিতরে তলিয়ে যায়। কিন্তু 'মোহন-বাগান'কে আজ উপর-উপরি তিন-তিনটে আস্ত 'গোল' হজম করতে দেখে আমাদেরও সমস্ত রক্ত যেন জল হ'য়ে গেছে!

অসিত অত্যন্ত বিরক্তস্বরে বলছিল, "দুত্তোর নিকুচি করেচে! আর খেলা দেখতে আসব না—যেদিন আসব, সেইদিনই হারবে? ডিস্‌গ্রেস্‌ফুল!"

অমিয় বললে, "এ কথা তো রোজই বলি, কিন্তু 'মোহন-বাগান' খেলবে শুন্‌লে বাড়ীতে হাত-পা গুটিয়ে ব'সেই বা থাকতে পারি কই?"

পরেশ বললে, "ঐ তো আমাদের রোগ; চড়ুকে পিঠ, সড়্‌সড়্‌ করে যে!"

নরেশ বললে, "না এসেই বা করি কি বল? বাঙালীর জীবনে আর কোন 'অ্যাডভেঞ্চার' নেই তো। তবু আমাদেরই জাতভাইরা গোরাদের সঙ্গে ধাক্কাধাকি করচে, খানিকক্ষণ এটা দেখলেও রক্ত খানিকটা গরম হ'য়ে ওঠে!"

বীরেন-দা এতক্ষণ চুপ ক'রে একপাশে ব'সে শিস্‌ দিচ্ছিল, হঠাৎ সে ব'লে উঠল, "ওঃ, ফুটবল-খেলা দেখা যদি 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার' হয়, তাহ'লে মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে হাত-পা ছোঁড়াও তো মস্ত-বড 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার'!"

বীরেনদা আমাদের সকলের চেয়ে তিন-চার বৎসরের বড়! তাই আমরা সকলেই তাকে অনেকটা দলপতির মতই দেখি! তর্ক-বিতর্ক হ'লে তাকেই মধ্যস্থ মানি, বিপদে-আপদে তার কাছ থেকেই সাহায্য

পাই। সে কুস্তি জানে, 'বক্সিং' জানে, লাঠি-তরোয়াল খেলতে জানে, জাপানী 'যুযুৎসু'রও এমন-সব আশ্চর্য্য প্যাঁচ জানে যে, তার চেয়ে ঢের বড় জোয়ানকেও চোখের নিমেষে তুলে আছাড় মারতে পারে। তার উৎসাহে আমরাও রোজ ব্যায়াম করি বটে, কিন্তু গায়ের জোরে আমরা কেউ তার কাছ দিয়েও যাই না।

এ-হেন বীরেনদা হঠাৎ প্রতিবাদ করাতে সকলে একেবারে চুপ মেরে গেল।

বীরেনদা একটু থেমে আবার বললে, "অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কথা তো বললে, কিন্তু আসল শক্তি আছে কি?"

আমি বললুম, "বীরেনদা, তোমার কথায় আমরা তো শক্তিচর্চ্চায় অবহেলা করি না! আমাদের গায়ে তোমার মত জোর না থাকলেও, আমরাও নেহাৎ দুর্ব্বল নই তো!"

বীরেনদা বললে, "আমি সে-শক্তির কথা বলচি না—সে তো পশুর শক্তি! সাহস, সাহস—সাহসই হচ্ছে আসল শক্তি! মোষের চেয়ে চিতেবাঘের গায়ে ঢের কম জোর। তবু চিতেবাঘের কবলে মোষ যে মারা পড়ে, তার কারণ মোষ হচ্ছে ভীরু জীব। সহজে পোষ মানে, সহজে মারা পড়ে। বাঙালীরও আসল অভাব সাহসের,—তার মুখে তাই 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারে'র কথা শুনলে আমার হাসি পায়!"

নরেশ বললে, "বীরেনদা, আমাদের যে সাহসেরও অভাব আছে, এমন কথাই বা তুমি মনে করচ কেন?"

বীরেনদা বললে, "মনে করবার কারণ নিশ্চয়ই আছে! ঘরের কোণ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়া, তাতে আর কতটুকু সাহসের দরকার! কিন্তু

বাঙালীর সেটুকু সাহসও নেই! তারা ঘরের কোণে শুয়ে রোগে ভুগে মরবে, তবু চৌকাঠের বাইরে পা বাড়াবে না।"

পরেশ বললে, "কিন্তু আমরা সে দলেই নই। আমরা বাইরে বেরুতে রাজি আছি—কোথায় যেতে হবে বল!"

গম্ভীর মুখে বীরেনদা বললে, "তাহ'লে চল দেখি আমার সঙ্গে!"

—"কোথায়?"

—"কাম্বোডিয়ায়!"

—"কাম্বোডিয়ায়? শ্যামের কাছে?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, শ্যামের কাছে! পারবে যেতে?"

সবাই চুপ।

বীরেনদা হা-হা ক'রে হেসে উঠে বললে, "কি, আর কারুর মুখেই রা নেই যে? এই না বললে, তোমরা বাইরে বেরুতে রাজি আছ?"

—"হ্যাঁ, রাজি আছি। আগ্রা চল, দিল্লী চল, আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু এক-কথায় সাত-সমুদ্র তেরো-নদীর পারে যেতে কি রাজি হওয়া চলে?"

—"নিশ্চয়ই চলে,—তাকেই তো বলি 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার'! কাম্বোডিয়া তো ভারতের দরজার কাছে, যারা 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার' চায় তারা এককথায় উত্তরমেরুর ওপারেও যেতে রাজি হবে! দিল্লী-আগ্রা তো একটা শিশুও যেতে পারে, তাতে আর বাহাদুরিটা কি?"

অসিত বললে, "বীরেনদা, তুমি কি আমাদের পরীক্ষা করচ? সত্যিই কি তুমি কাম্বোডিয়ায় যেতে চাও?"

—"আমার যে কথা, সেই কাজ। আজ ক'দিন ধ'রে আমার

মনে কাম্বোডিয়ায় যাবার সাধ হয়েচে। সেদিন সেখানকার ওঙ্কারধাম নামে এক মন্দিরের কথা পড়লুম। সেখানে নাকি বিরাট এক নগরের ধ্বংসাবশেষ প'ড়ে আছে, আর তার ভেতরে এক অদ্ভূত মন্দির! সে-সব হচ্ছে প্রাচীন ভারতবাসীর কীর্ত্তি, আর সে কীর্ত্তির কাছে নাকি জগন্নাথ, ভুবনেশ্বর, সাঁচীর মন্দিরও ম্লান হয়ে যায়। জানো, আমি আমার ভারতবর্ষকে কত ভালোবাসি? তাই ভারতের সেই অমর-কীর্ত্তি আমি দেখতে যাব!"

আমি বললুম, "বীরেনদা, তোমার সঙ্গে আমি যাব!"

বীরেনদা আনন্দে দুই চোখ বিস্ফারিত ক'রে বললে, "সত্যি? সত্যি বলচ সরল?"

আমি হেসে বললুম, "আমার নামও সরল, আমি কথাও কই সরল ভাষায়। যখন যাব বল্‌চি, তখন নিশ্চয়ই যাব!"

বীরেনদা বললে, "শুনে সুখী হলুম। কিন্তু সরল, ভেবে দেখ, ওঙ্কার-ধামে যেতে গেলে বাবুয়ানা চলবে না, আরামেরও সম্ভাবনা নেই। প্রথম কয়দিন কাটবে জাহাজে—অগাধ, অপার সমুদ্রের উপরে। তারপরে রেলগাড়ী, তারপর কিসের গাড়ী—তা জানিনা। হয়তো ক্রোশের পর ক্রোশ পায়ে হেঁটেই যেতে হবে প্রাণটি হাতে ক'রে।"

—"প্রাণ হাতে ক'রে কেন?"

"ওঙ্কার-ধামের ত্রিসীমানার ভেতরে লোকালয় নেই। ক্রোশের পরে ক্রোশ খালি জঙ্গল আর জঙ্গল—তেমন জঙ্গল হয়তো আমরা জীবনে চোখেও দেখি-নি! গভীর অরণ্যের ভেতরে সেই প্রাচীন মন্দির আর সহরের ধ্বংসাবশেষ! অতি সাহসীরও বুক সেখানে যেতে ভয়ে

কাঁপতে পারে। সেখানে মানুষের বাস নেই বটে, কিন্তু তবু মানুষ থাকাও অসম্ভব নয়। তবে সে-সব মানুষের সঙ্গে দেখা হ'লে আমাদের জীবন নিয়ে তারা যে টানাটানি করবে না, একথাও জোর ক'রে বলা যায় না। তার ওপরে বাঘ, ভাল্লুক, হাতী, সাপেরা সেখানে নিত্যই 'হোম-রুলে'র স্বাধীনতা ভোগ করচে। আমাদের মতন অতিথিদের দেখলে তারা আদর করবে না নিশ্চয়ই, কারণ তারা এখনো বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হয় নি। তার ওপরে আছে রোগের ভয়, দৈব-দুর্ঘটনা। হঠাৎ কিছু হ'লে ডাক্তার নীলরতন সরকারকেও খবর দেওয়া চলবে না, "আম্বুলেন্সকার"ও ডাকা যাবে না। এ-সব কথা তলিয়ে ভেবে দেখ, সরল!"

দৃঢ়স্বরে বললুম, "আমি কিছু ভেবে দেখতে চাইনা বীরেনদা, আমি খালি তোমার সঙ্গে যেতে চাই!"

অমিয় আচম্বিতে ব'লে উঠল, "আমিও কিছু ভাবব না বীরেনদা, তোমার সঙ্গে পোঁটলা বেঁধে বেরিয়ে পড়ব!"

বীরেনদা সবিস্ময়ে বললে, "তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে!"

—"কেন যাব না, আমি কি কাপুরুষ?"

—"না, তোমার কথা শুনে তোমাকে আর কাপুরুষ বলতে পারি না, কিন্তু তুমি আমাদের সঙ্গে কেমন ক'রে যাবে? তুমি তো সরলের মতন স্বাধীন নও, তোমার মা আছেন, বাবা আছেন। তাঁরা তোমাকে যেতে দেবেন কেন?"

অমিয় বললে, "আচ্ছা, মা-বাবাকে রাজি করাবার ভার আমার ওপরে রইল। বীরেনদা, তুমি জানোনা তোমার ওপরে আমার মা আর

বাবার কতখানি শ্রদ্ধা! এই সেদিন কথায় কথায় বাবা বলছিলেন, 'বীরেন সঙ্গে থাক্‌লে অমিয়কে আমি যমেরও মুখে ছেড়ে দিতে পারি। বীরেন যে দুর্ভেদ্য বর্ম্ম—দেবরাজের বজ্রও সে বর্ম্মে লেগে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যায়।' তুমি কি মনে কর বীরেনদা, আমার বাবা মিছে কথা বল্‌ছিলেন ?"

বীরেনদা মৃদু মৃদু হেসে বললে, "না, তা বলি না, তবে তাঁর বিশ্বাস অন্ধ হ'তেও পারে তো ?"

অমিয় বললে, "তোমাকে যে চিনেচে সেই-ই এই কথা বলবে। তোমার সঙ্গে মরতেও আমার ভয় করে না! আমি তোমার সঙ্গে যাব বীরেনদা!"

—"বেশ, তোমার মা-বাবা যদি মত দেন, আমারও অমত নেই।"

আমি বললুম, "তাহ'লে কবে আমরা রওনা হচ্ছি ?"

—"দু হপ্তার ভেতরে। কিন্তু যাবার আগে তিনটে বন্দুকের পাস চাই। রিভলভার তো আমার কাছেই আছে। জঙ্গলের ভেতরে বন্দুক-রিভলভারের মতন বন্ধু আর নেই।"

অসিত বললে, 'তাহ'লে সত্যিই তোমরা যাবে ?"

বীরেনদা বললে, "তোমার সন্দেহ হচ্ছে নাকি ?"

পরেশ বললে, "আমি একে সাহস বলি না, এ হচ্চে গোঁয়ার্ত্তুমি।"

নরেশ বললে, "তা নয় তো কি!"

বীরেনদা বললে, "বেশ, আমরা একটু গোঁয়ার্ত্তুমি ক'রেই দেখি না কেন ? তোমাদের মতন বুদ্ধিমান মাথা-ঠাণ্ডা লোকেদের 'অ্যাড্-

বিজয়া

ভেঞ্চারে'র জন্যে ফুটবল-খেলার মাঠ আছে, বায়স্কোপের ছবি আছে, ট্রামগাড়ীর বাঁধানো রাস্তা আছে, আর ম্যালেরিয়া জ্বরে শুয়ে শুয়ে আরাম ক'রে কাঁপ্‌বার জন্যে নরম বিছানা আর পুরু লেপ আছে। কিন্তু গোঁয়াররা উড়ো জাহাজে চড়ে, হিমালয়ের টঙে ঠাণ্ডা হাওয়া খেতে ওঠে, সাব-মেরিনে ব'সে সমুদ্রের অতলে ডুব দেয়—খালি মরবার জন্যেই। কিন্তু তারা না মরলে তো সারা-পৃথিবীর মানুষ আজ বাঁচতে পারত না! গোঁয়াররা মরতে জানে ব'লেই মানুষ আজ শ্রেষ্ঠ জীব হয়েচে!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতের অশ্রু

নীলিমার অসীম জগতে চলেছি, ভেসে চলেছি!

মাথার উপরে প্রশান্ত নীল আকাশ, পায়ের তলায় অশান্ত নীল সাগর,—যেদিকে তাকাই, আর কোন রং নেই! বিশ্বময় নীলিমা যেন থৈ থৈ কর্‌ছে!

এরই মাঝখান দিয়ে সিন্ধুর বুকে বিন্দুর মত জাহাজ ভেসে চলেছে, তার পিছনে এঁকে রেখে,—নীল পটে সাদা ফেন-আল্পনার দীর্ঘ রেখা!

পৃথিবীর মাটির গান আর শোনা যায় না—বনের মর্ম্মর, পাখীর রাগিণী, নদীর তান! বাতাস সুধু মাটির স্মৃতি বহন ক'রে আনছে, কিন্তু তার উদাসী নিঃশ্বাস আজ হারিয়ে ফেলেছে ফুলের মৃদু গন্ধ!

কী বিস্ময়! কী আনন্দ!—চারিদিক থেকে অনন্ত আজ যেন আমাদের আকুল আহ্বান কর্‌ছে!

অমিয় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠল—"বীরেনদা, বীরেনদা! আমাদের এতদিনের চেনা পৃথিবী যে দুদিনেই এমন অচেনা হয়ে উঠতে পারে, তা আমি স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারিনি তো!"

বীরেনদা হেসে তার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বললে, "মায়ের কোলে শুয়ে আর ইস্কুল-বই প'ড়ে কি পৃথিবীকে চেনা যায় ভাই! কূপে বসে ব্যাঙ যেমন দেখে জগৎ কূপের মত, ঘরে ব'সে আমরাও

তেমনি দেখি পৃথিবীকে চার দেওয়ালের মাঝে বন্দিনীর মতন! কিন্তু আজ আমরা স্বাধীন পৃথিবীর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি,—স্বাধীনতার যে কত রূপ এবারে আমরা চোখের সাম্‌নে তা দেখতে পাব!"

আমি বললুম, "কিন্তু দেশের জন্যে আমার বড় মন কেমন করচে বীরেনদা! মনে হচ্ছে পৃথিবীর যত রূপই থাক্, আমার বাংলাদেশে ব'সে সবুজ গাছপালার ভিতরে, ধান-দোলানো সোনা-ছড়ানো মাঠের উপর যে রূপ দেখি, সে রূপের চেয়ে মিষ্টি যেন আর কিছুই নেই!"

বীরেনদা মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

আমি বললুম, "তুমি হাস্‌চ বীরেনদা? কুণো বাঙালী ভেবে মনে মনে আমাকে বুঝি ঘৃণা করচ?"

বীরেনদা গম্ভীর হয়ে বললে, "না ভাই সরল, আমি কি তোমাকে ঘৃণা করতে পারি? তুমি মানুষ, তাই দেশের জন্যে তোমার প্রাণ কাঁদ্‌চে। আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। দেখনা, এই যে ইংরেজ জাত, দেশ ছেড়ে তারা পৃথিবীর কোথায় না যায়? তাব'লে তাদের প্রাণ কি দেশের জন্যে কাঁদে না? কাঁদে বৈকি! তবু তারা দেশ ছাড়ে দেশকেই বড় করবার জন্যে। কিন্তু তারা যেখানেই থাক্, আফ্রিকার জঙ্গলে, সাহারার মরু-প্রান্তরে আর হিমালয়ের তুষার-শিখরে ব'সে তারা সুধু এক গানই গাইবে—'হাম, হোম, সুইট হোম'। বিলাতের কুয়াসাকেও তারা ভালোবাসে। আর আমাদের বাবু-সায়েবরা? বিলাতে গিয়ে তাঁরা স্বদেশকেই ভুলতে চান! পরেন হ্যাট-কোট, ধরেন ফিরিঙ্গী চাল আর স্বপ্ন দেখেন ইংরেজীতে! বাংলা ভাষা ভুলে

যাওয়া তাঁদের কাছে জাঁকের কথা ! তাদের আমি ঘৃণা করি সরল, কারণ 'আমার সোণার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি,'—এ গান তারা গাইতে জানে না ! দেশের জন্যে আমাদের মন কাঁদবে বৈকি,—আমরা তো দেশকে ভোলবার জন্যে বিদেশে যাচ্ছি না ভাই, আমরা যে যাচ্ছি স্বদেশকে ভালো ক'রে চেনবার জন্যেই !"

অমিয় বললে, "স্বদেশকে ভালো ক'রে চেনবার জন্যে ?"

—"হ্যাঁ ভাই ! আমরা যাচ্ছি আমাদের সোণার ভারতের গৌরব দেখবার জন্যে। আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে গেলে ভারতের বাইরে ব'সেও ভারতের মূর্ত্তিকে আরো বড় ক'রে দেখতে পাব।"

আমি বললুম, "ওঙ্কারধাম তো অজন্তা, ইলোরা, ভুবনেশ্বরের কি মাদুরার মন্দিরের মতনই একটি মন্দির ?"

—"না, ওঙ্কার হচ্চে প্রাচীন হিন্দুজাতির আরো বড় কীর্ত্তি, তোমার ইলোরা কি ভুবনেশ্বরের মন্দির বিপুলতায় তার কাছে দাঁড়াতে পারেনা। সাগর পার হয়ে কৌণ্ডিণ্য নামে এক ব্রাহ্মণ প্রায় দুই হাজার বছর আগে কম্বোজে হিন্দু রাজত্বের সূচনা করেন। কয় শত বৎসর পরে সেই ছোট উপনিবেশ একটা বৃহৎ হিন্দু সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। তার রাজধানীর নাম হয় যশোধরপুর। আমরা ভারতের বাইরে সেই ভারতকেই দেখতে চলেছি—যেখানে সাত শো বছর ধ'রে উড়েছিল আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের বিজয়-পতাকা। যশোধরপুরের ধ্বংসাবশেষ আজ ক্রোশের পর ক্রোশ জুড়ে প'ড়ে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছে, তার অগুন্তি মন্দিরের ভিতরে একটিতেও আজ সন্ধ্যাদীপ জ্বালবার মানুষ নেই। দেশের

জন্যে এখনি তোমার প্রাণ কাঁদচে তো সরল, কিন্তু যশোধরপুরে গিয়ে আমরা কি করব বল দেখি ?”

—“আমরা কি করব বীরেনদা ?”

—“কাঁদব !”

- “কাঁদব ! কেন ?”

—“একদিন যে হিন্দু নিজের বীরত্বে সমুদ্রের ওপারে বিপুল সাম্রাজ্য গ’ড়ে তুলেছিল, ভারতের বাইরেও ভারতবাসীর জন্যে নূতন আর স্বাধীন স্বদেশ তৈরি করেছিল, আজ তারই সন্তানের সেখানে গিয়ে কাঁদবার অধিকার ছাড়া আর কোন অধিকার যে নেই ! হ্যাঁ সরল, যশোধর-পুরের ধ্বংসাবশেষের উপরে আমরা ফোঁটা-কয়েক অশ্রু রেখে আসব ।”

—বলতে বলতে বীরেনদার গলার আওয়াজ ভারি হয়ে এল, আমরা অবাক হয়ে চেয়ে দেখলুম তার দুই চোখে অশ্রুজল ভ’রে উঠেছে ।

বীরেনদা ভারতবর্ষকে কত ভালোবাসে !

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জাগরণের দেশে

আমাদের জাহাজ সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছলো। জাহাজ এখানে অনেকক্ষণ থামবে শুনে আমরা তীরে নেমে পড়লুম। আজ ক'দিন পরে ডাঙার মানুষ আমরা, পায়ের তলায় আবার মাটিকে পেয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

সিঙ্গাপুরের কথা সকলেই জানেন, কাজেই সে কথা আমি আর এখানে বলতে চাই না।

সিঙ্গাপুরে নানাজাতীয় রকম-বেরকমের মুখ দেখলুম—এ সহরটা যেন দুনিয়ার নানা জাতির চেহারার নমুনা নেবার জায়গা। এখান থেকে আমরা কোচীন-চীনের বন্দর সাইগনে যাত্রা করব—সেও প্রায় চারদিনের পথ। তার পর সেখান থেকে যাব যশোধরপুরের ওঙ্কারধামে।

জাহাজ যখন সিঙ্গাপুর ছাড়্‌ল, দেখলুম যাত্রীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। এই নূতন যাত্রীরা সবাই প্রায় চীনেম্যান।

অমিয় বললে, "এইবার থেকে থ্যাবড়া-নাকের দেশ সুরু হবে!"

বীরেনদা বললে, "না অমিয়, এইবার থেকে স্বাধীন এসিয়া সুরু হবে! ঘুমের দেশ থেকে এইবার আমরা জাগরণের দেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি—যে-দেশ সাদা-চামড়ার লোহার বেড়ী পায়ে পরে-নি!"

আমরা চলেছি উত্তর দিকে —বাঁ-দিকে আছে মালয় উপদ্বীপ।……

দ্বিতীয় দিনের রাত্রে হঠাৎ আমাদের ঘুম ভেঙে গেল!—জেগে উঠেই শুনি ভীষণ গোলমাল, বন্দুকের শব্দ, অনেকগুলো পায়ের ছুটোছুটির আওয়াজ, অনেকগুলো কণ্ঠের চীৎকার আর আর্ত্তনাদ!

আমাদের দুজনকে কাম্‌রা থেকে বেরুতে বারণ ক'রে বীরেনদা তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে গেল।

হতভম্বের মতন ব'সে আছি, বীরেনদা আবার দ্রুতপদে ফিরে এসে কামরার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিলে। তার মুখ বিবর্ণ!

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কি হয়েচে বীরেনদা?"

—"বোম্বেটে!"

—"বোম্বেটে?"

—"হ্যাঁ, সিঙ্গাপুর থেকে একদল বোম্বেটে যাত্রী সেজে জাহাজের উপরে উঠেছিল। তারা জাহাজের লোকদের আক্রমণ করেচে!"

আমি আর অমিয় একলাফে বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলুম।

বীরেনদা বললে, "এই চীনে-সমুদ্র হচ্ছে বোম্বেটের স্বর্গ! এ বোম্বেটেরা বড় নিষ্ঠুর, কারুকে এরা ক্ষমা করে না।—সরল, অমিয়!"

বন্দুকের বাক্স খুলতে খুলতে আমি বল্‌লুম, "তাহ'লে কি আমাদের এখন বোম্বেটেদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে?"

—"বোম্বেটেরা দলে ভারি, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা বৃথা। তবে এও ঠিক যে, আমরা কাপুরুষের যতন মরব না। কি বল সরল? কি বল অমিয়?"

বন্দুকে টোটা পূরতে পূরতে আমি বললুম, "মরি যদি, মেরে মরব!"

অমিয় বীরেনদার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, "আমি তো আগেই বলেচি বীরেনদা, তোমার সঙ্গে মরতেও আমার ভয় করে না!"

বীরেনদা বললে, "জানি, জানি, তোমরা হ'চ্চ খাঁটি ইস্পাত, দুমড়োলেও ভাঙবে না!"

বাইরে যাত্রীদের কান্না আর বোম্বেটেদের চীৎকার আরো বেড়ে উঠল!

বীরেনদা বললে, "কাপুরুষদের কান্না শোনো! ওরা ভুলে গেছে, কেঁদে কেউ কোনদিন বাঁচতে পারে না!"

অমিয় বলিলে, "বীরেনদা, লড়াই করবার জন্যে আমার হাতদুটো যেন নিস্‌পিস্ করচে!"

—"সব যথাসময়ে ভাই, সব যথাসময়ে! মরবার সময় এলে হাসি-মুখেই মরব, কিন্তু এখন দেখা যাক্ বাঁচবার কোন উপায় আছে কিনা!"

আমি বললুম, "ডাঙা হ'লেও কথা ছিল, কিন্তু এ যে অগাধ সমুদ্র বীরেনদা! মুক্তির কোন উপায়ই নেই!"

—"গোলমালটা হচ্চে জাহাজের বাঁ-দিকে। ডানদিকে কোন সাড়াশব্দ নেই! আচ্ছা, তোমরা আমার পিছনে পিছনে চুপি চুপি এস! আমি না বললে কিন্তু বন্দুক ছুঁড়ো না।"—এই ব'লে বীরেনদা কামরার দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে বাঁদিকে একবার চেয়ে দেখলে। তারপর আমাদের ইঙ্গিত ক'রে ডানদিকের পথ ধরলে। আমরা দুজনে গুড়ি মেরে তার পিছনে পিছনে চললুম।

জাহাজের এদিকটা অন্ধকার, সমুদ্রের বুকে অন্ধকার, আকাশেও আলোর রেখা নেই!
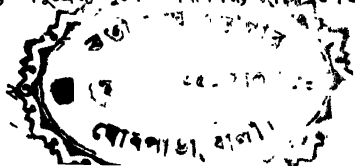
আচম্বিতে কি-একটা শব্দ হ'ল, পরমুহূর্তেই বীরেনদা সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল এবং তার পরেই সমুদ্রের ভিতরে ঝপাং ক'রে আর-একটা শব্দ !

কিছুই বুঝতে না পেরে আমরা দুজনেও দাঁড়িয়ে পড়লুম।

চুপিচুপি বললুম, "কি হ'ল বীরেনদা ?"

—"একটা বোম্বেটে কম্‌ল ! অন্ধকারের ভেতর থেকে লোকটা হঠাৎ আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছিল, কিন্তু সে জানত না যে, আমার এই হাতদুটো ছ'মণ বোঝা তুলতে পারে ! তোমরা টের পাবার আগেই, একটা টু-শব্দ করতে না করতেই তাকে তুলে সমুদ্রে ছেড়ে দিয়েচি ! পাতালে যেতে তার আর দেরি লাগবে না !"

যে-হাত এত সহজে এমন কাণ্ড করতে পারে, অন্য সময় হ'লে সে-হাতের শক্তির কথা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে ভাবতুম ! কিন্তু এখন আর ভাববার সময় নেই, কারণ পিছনে কাদের চীৎকার আর পদশব্দ শুনলুম !

বীরেনদা বললে, "সাবধান ! দৌড়ে আমার সঙ্গে এস !"

কিন্তু বেশী দূর দৌড়তে হ'ল না,—আমরা একেবারে জাহাজের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ালুম। তারপরেই রেলিং, আর তার নীচেই সমুদ্র !

বীরেনদা বললে, "আপাততঃ আমরা বেঁচে গেলুম !"

—"কি ক'রে বীরেনদা, বোম্বেটেরা যে এসে পড়ল !"

—"না, ওরা আমাদের দেখতে পায় নি। এদিকে কোন কাম্‌রা নেই, ওরা বোধ হয় খানিকক্ষণ এদিকে আসবে না। কিন্তু তার আগেই আমরা নিরাপদ হ'তে চাই ! আমি এদিকে এসেচি কেন জানো ?

এই দড়ীগুলোর জন্যে! এই দড়ীগুলো যে এখানে আছে, আমি দিনের বেলাতেই তা দেখেছিলুম।”

সেখানে অনেকগুলো কাছি কুণ্ডলী-পাকানো অজগরের মতন প’ড়ে আছে বটে!

আমি বললুম, “কিন্তু এ দড়ীগুলো নিয়ে আমরা করব কি?”

বীরেনদা বললে, “দেখচ, এই দড়ীগুলো জাহাজের সঙ্গে বাঁধাই আছে? তিনগাছা দড়ী সমুদ্রের ভিতরে ফেলে, আপাততঃ আমরা কি আর একটা রাত দড়ী ধ’রে ভাসতে পারব না?”

—“কিন্তু তারপর?”

—“পরের কথা পরে ভাবা যাবে! আবার পায়ের শব্দ শুনচি, নাও—আর দেরি নয়!”

বীরেনদার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও এক এক গাছা দড়ী সমুদ্রের ভিতরে ফেলে দিলুম। অনেক জিম্‌নাষ্টিক করেছি, সুতরাং দড়ীগুলো ধ’রে নীচে নেমে যেতে আমাদের কোনই অসুবিধা হ’ল না!

সমুদ্রের জল যখন আমার কোমর পর্য্যন্ত গ্রাস করেছে, বীরেনদা হাসতে হাসতে ব’লে উঠল, “আমরা ‘অ্যাড্‌ভেঞ্চার’ খুঁজছিলুম, কিন্তু আর তাকে খুঁজতে হবে না, কি বল সরল?”

আমি বললুম, “তবে এ ‘অ্যাড্‌ভেঞ্চারে’র গল্প দেশে গিয়ে করতে পারব না, এই যা দুঃখ!”

অমিয় বললে, “সেদিন তুমি বলছিলে না বীরেনদা, আমরা জাগরণের দেশের দিকে যাচ্চি? সে কথা ঠিক! আজ সারা রাতই আমাদের আর ঘুমোতে হবে না!”

আমি বললুম, "হায় হায়! তিন-তিনটি ভারত-সন্তান জেগে উঠে মোটা কাছি নিয়ে গভীর রাতে যে আজ সাগর-মন্থনে নেমেছেন, যাঁরা স্বদেশী কবিতা লেখেন এ দৃশ্য তাঁরা দেখতে পেলেন না তো!"

অমিয় দড়ী ধ'রে ভাস্‌তে ভাস্‌তে গুণ গুণ ক'রে একটা হাসির গান গাইতে লাগল এবং তার সঙ্গে শীস্‌ দিতে সুরু করলে বীরেনদা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মস্ত-বড় হাঁ আর ধারালো দাঁত

অন্ধকারের তরঙ্গ বইছে মাথার উপরে,—সমুদ্রের তরঙ্গ বইছে দেহের চারিপাশ ঘিরে!—দড়ী ধ'রে আমরা ভাসছি, আর ভাবছি, যা দেখছি আর অনুভব করছি এ কি সত্য, এ কি স্বপ্ন?

হঠাৎ আমাদের আশেপাশে ঝপাং ঝপাং ক'রে শব্দ হ'তে লাগল! —যেন উপর থেকে কী সব পড়ছে! ভাবলুম, বোম্বেটেরা নিশ্চয় টের পেয়েছে যে, জাহাজের সঙ্গে আমরাও দড়ী ধ'রে ভেসে চলেছি, তাই আমাদের মারবার জন্যে ভারি ভারি জিনিষ ছুঁড়ছে!

কিন্তু বীরেনদা বললে, "আমি শুনেছি, বোম্বেটেরা যখন জাহাজ দখল করে তখন মাঝে মাঝে যাত্রীদের হত্যা ক'রে সমুদ্রে ফেলে দেয়। আমাদের চারিদিকে যে সব শব্দ হচ্ছে, নিশ্চয় তা এক-একটা লাশ পড়ার শব্দ!"

সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল!—জাহাজের উপরে থাক্‌লে আমাদেরও তো এই অবস্থা হ'ত! এতক্ষণে আমাদেরও দেহ হয়তো চীন-সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে কোথায় চ'লে যেত!

আচম্বিতে আমার খুব কাছেই একটা শব্দ হ'ল—এত কাছে যে, সমুদ্রের জল ছিটকে আমার চোখে-মুখে লাগল! একটু পরেই কি-একটা জিনিষ আমার গায়ে এসে ঠেক্‌ল। হাত দিয়ে সেটাকে ঠেলে

দিতে গিয়েই বুঝলুম, সেটা মানুষের দেহই বটে !—ঠাণ্ডা, অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা ! জ্যান্ত মানুষের দেহ এত ঠাণ্ডা হয় না !

তাড়াতাড়ি দেহটাকে দূরে ঠেলে দিয়ে আমি অস্ফুট চীৎকার ক'রে উঠলুম !

বীরেনদা বললে, "কি হ'ল, কি হ'ল সরল ?"

আমি শিউরোতে শিউরোতে বললুম, "একটা মড়া ! আমি একটা মড়ার গায়ে হাত দিয়েচি !"

বীরেনদা বললে, "সেজন্যে আঁৎকে উঠলে কেন ?"

—"জীবনে এই প্রথম আমি মড়ার গায়ে হাত দিলুম ! হাত দিতেই আমার দেহের ভিতরটা যেন কি-রকম ক'রে উঠল !"

—"সেজন্যে আজ আঁৎকে উঠে লাভ নেই সরল ! যে-অবস্থায় আমরা পড়েচি, তাতে কাল্‌কে হয়তো আমাদেরই ঐ-রকম মড়া হ'তে হবে ! রবিঠাকুরের ভাষায় এখন আমাদের 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' —প্রাণ নিয়ে এখন আমাদের খেলা করতে হবে—তা সে প্রাণ নিজেরই হোক্, আর পরেরই হোক্ !"

অমিয় বললে, "বীরেনদা, সেদিন একটি কবিতা প'ড়েছিলুম আজ আমার তাই মনে হচ্ছে !"

বীরেনদা বললে, "সাবাস অমিয়, তুমি বাহাদুর ছেলে বটে ! এমন সময়েও তোমার কবিতার কথা মনে হচ্ছে ?"

—"কবিতার খানিকটা শোনো :—

মরণ আমার খেলার সাথী,
জীবনও মোর তাই,

এই দুনিয়ায় খেল্‌তে আসা ;
ভাব্‌না কিছুই নাই !
নেচে বেড়াই দরাজ বুকে,
অট্টহাসি হাস্‌চি মুখে,
বাঁচি যেমন পরম সুখে,
ম'রেও আমোদ পাই—
হো হো, ভাব্‌না কিছুই নাই !—

সত্যি বল্‌চি বীরেনদা, আজকের রাতটিকে আমার ভারি ভালো লাগ্‌চে !"

প্রথম সূর্য্যোদয় দেখলুম ! কাল্‌কের রাতে যে-সব হতভাগ্যের বুকের রক্ত সমুদ্রের উপরে ঝ'রে পড়েছে, যেন তাই মেখেই রাঙা হ'য়ে জলের ভিতর থেকে সূর্য্যদেব আজ তাঁর মাথা তুলে নীলাকাশের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন !

কোনদিকে তীরের আভাস পেলুম না—থৈ-থৈ করছে খালি অনন্ত নীলজল। জাহাজের উপরে নিরাপদে ব'সে এই কয়দিন সমুদ্রকে যেমন মধুর লাগছিল, আজ আর তেমনটি লাগল না !

সারা রাত জলে থেকে এখন সকালের বাতাসে দেহের ভিতরে শীতের কাঁপুনি ধরল। তার উপরে নানান ভাবনা ! সমুদ্রে ভেসে না-হয় বোম্বেটের ছুরি থেকে আপাততঃ রেহাই পেয়েছি, কিন্তু মানুষের দেহ তো লোহা কি পাথর নয়, এমন ভাবে জলের ভিতরে আর ক'দিন থাকতে পারব ? আর না-হয় জলেরই ভিতরে কোনরকমে রইলুম, কিন্তু কি খেয়ে বেঁচে থাকব ?

অমিয় আচম্‌কা চেঁচিয়ে উঠল, "হাঙর! হাঙর!"

চম্‌কে ফিরে তাকিয়ে দেখি, মস্ত-বড় একটা হাঁ, আর তার ভিতরে কতকগুলো ধারালো, চক্‌চকে দাঁত! সাদা মাছের মত প্রকাণ্ড একটা দেহও চোখে পড়ল! কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই দেহটা জলের ভিতরে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলিয়ে মিলিয়ে গেল।

বীরেনদা দড়ী ধ'রে উপরে উঠতে উঠতে বললে, "ওপরে ওঠ, ওপরে ওঠ!"

আমি আর অমিয়ও দড়ী ধ'রে উপরে উঠে গেলুম এবং পর-পলকেই দেখলুম, হাঙরটা ঠিক আমাদের নীচে এসে হাজির হয়েছে!

শীকার পালিয়েছে দেখে সে যে খুবই ক্ষাপ্পা হয়েছে, তার প্রমাণ দেবার জন্যে সে জল থেকে আমাদের দিকে মস্ত একটা লম্ফ ত্যাগ করলে, কিন্তু আমরা তখন তার নাগালের বাইরে!

তবু সে আশা ছাড়লে না—জাহাজের পিছনে পিছনে আসতে এবং মাঝে মাঝে দাঁত বার ক'রে কুৎসিত হাই তুলতে লাগল!

এদিকে দড়ী ধ'রে উপরে ঝুলতে ঝুলতে আমাদের হাত ভেরে এল—অথচ আমাদের এখন উপরে ওঠবারও যো নেই বোম্বেটেদের ভয়ে এবং জলে নামবারও উপায় নেই হাঙরের ভয়ে!

এমন সময়েও আমি ঠাট্টা করবার লোভ সাম্‌লাতে পারলুম না। অমিয়কে জিজ্ঞাসা করলুম, "কি ভায়া, এমন অবস্থায় পড়লে তোমার কবি কি বলতেন? মরণকে কি তাঁর খেলার-সাথী ব'লে মনে হ'ত?"

অমিয় তখনও দম্‌বার পাত্র নয়। সে হেসে বললে, "আচ্ছা সরল-দা, হাঙরের ক'টা দাঁত আছে গুণে দেখ দেখি।"

আমি অগত্যা মনে মনে হার মেনে প্রকাশ্যে বললুম, "সেজন্যে এখনি মাথা ঘামাবার দরকার নেই। একটু পরে সকলকেই তো হাঙরের পেটের ভিতরে ঢুকতে হবে, তখন দাঁত গুণে দেখবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে!"

অমিয়র মুখ তখন রাঙা-টক্‌টকে হয়ে উঠেছে, সে যেন নিজের কণ্ঠ প্রাণপণে চাপতে চাপতে বললে, "না সরল-দা, আমাকে কিন্তু এখনি মাথা ঘামাতে হচ্চে। আমার হাত একেবারে অবশ হয়ে গেছে, আমাকে এখনি হাঙরের পেটের ভিতরেই যাত্রা করতে হবে!"

বীরেনদা তাড়াতাড়ি জামার ভিতর দিকে হাত চালিয়ে একটা রিভলভার বার ক'রে বললে, "বোম্বেটেরা পাছে শুনতে পায় সেই ভয়ে এতক্ষণ রিভলভার ছুঁড়তে পারছিলুম না। কিন্তু এখন দেখচি না ছুঁড়ে আর উপায় নেই।"—ব'লেই সে হাঙরটাকে লক্ষ্য ক'রে উপর-উপরি দু'বার রিভালভার ছুঁড়লে।

হাঙর-বাবাজী মানুষের বদলে দু-দুটো গরম সিসের গুলি খেয়েই টো ক'রে জলের তলায় ডুব মারলে! সে বাঁচ্‌ল কি মরল জানিনা, তবে জলের উপরে দেখা গেল, খানিকটা রক্তের দাগ!

রিভলভারের আওয়াজ যে জাহাজের উপর থেকে কেউ শুনতে পেয়েছে, তারও কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। আমরা তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আবার জলের ভিতরে নামলুম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দড়ি কে টানে

সকালবেলায় সূর্য্যকে দেখে খুব খুসি হয়েছিলুম। কিন্তু তখন ভাবতে পারি-নি যে, সেই সূর্য্যকেই পরে অভিশাপ দিতে হবে!

কে আগে জান্‌ত যে, রোদে সমুদ্রেব জলও এমন গরম আর সূর্য্যের তাপ এমন অসহনীয় হয়ে ওঠে? তরঙ্গের সঙ্গে নৃত্যশীল সূর্য্য-কিরণ যে এত তীব্র হ'য়ে উঠে চোখ প্রায় কাণা ক'রে দিতে পারে, তাও আমাদের জানা ছিল না।

একে কাল রাত থেকে একঢোঁক্‌ও জল পান করিনি, তার উপরে সূর্য্যের এই অত্যাচার! সমুদ্রের বিপুল জলরাশির ভিতরেও বারংবার ডুব দিয়ে মনে হ'তে লাগল, বুকের ভিতরটা যেন মরুভূমির মতন শুকিয়ে গিয়েছে—জল নেই, সেখানে এক ফোঁটাও জল নেই!

অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! এত জল এখানে, অথচ জলাভাবে আমরা মরতে বসেছি!

এক-একবার আর সইতে না পেরে সমুদ্রের জলে চুমুক দি, আর তার ভীষণ তিক্ততায় তখনি তা উগ্‌রে ফেলতে পথ পাই না! অমন নীল-পদ্মের নীলিমা-মাখানো সুন্দর জল, কিন্তু তা পান করা কি অসম্ভব!

কাল থেকে ঘুমোয় নি। সারাদিন আহারও নেই। তার উপরে

সমান এই দড়ী ধ'রে ঝুলে থাকা—জলের ভিতরে ভাসছি বটে, কিন্তু হাতদুটো যেন ছিঁড়ে পড়ছে!

জাহাজ সমানে চলেছে—কিন্তু তখনো কোনদিকে ডাঙা দেখা যাচ্ছে না।

তারপর সূর্য্য যখন অস্ত গেল, তখন আমরা প্রায় মরো-মরো হয়ে পড়েছি।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল, ধীরে ধীরে আবার সেই অন্ধকার ঘন হয়ে উঠতে লাগলো—যে-অন্ধকারের ভিতরে কাল এক রাত্রেই আমাদের জীবনটা উল্টে-পাল্টে একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে!

সন্ধ্যা এল, আঁধার এল, রাত্রি এল। কিন্তু সূর্য্যের তাপে কণ্ঠের ভিতরে যে তৃষ্ণার আগুন জ্ব'লে উঠেছে, সে আগুন না-নিবে প্রবল হয়ে উঠল দ্বিগুণতর।

আমি বললুম, "বীরেনদা, মরতে আমি ভয় পাই না, কিন্তু এমন তিলে তিলে মরণের দিকে এগিয়ে যাওয়া ভয়ানক নয় কি?"

অমিয় বললে, "হ্যাঁ সরলদা, এবারে আমিও তোমার সঙ্গে একমত। এমন বেঁচে-থাকার কষ্ট আর সওয়া চলে না! তার চেয়ে এস, আমরা দড়ী ছেড়ে ডুব দি, পাঁচ মিনিটেই সব ব্যথা জুড়িয়ে যাবে।"

বীরেনদা একটাও কথা কইলে না।

জাহাজের ছায়া যেখানে জলের উপরে শেষ হয়েছে তার পরের অনেকখানি জায়গা আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এ আলো আসছে জাহাজের উপর থেকে। এই আলো দেখছি আর মনে হচ্ছে, আমরা অন্ধকারে অনাহারে অনিদ্রায় তৃষ্ণায় আর পরিশ্রমে মরণোন্মুখ হয়েছি,

আর জাহাজের উপরে আলোকিত কক্ষে ব'সে এখন এতদল হত্যাকারী সয়তান—

আমার চিন্তায় বাধা দিয়ে অমিয় বললে, "বীরেনদা, আর নয়,—এই আমি দড়ী ছাড়লুম !"

বীরেনদা বললে, "না অমিয়, আর একটু অপেক্ষা কর।"

—"আর অপেক্ষা ক'রে মিছে কষ্ট বাড়াই কেন বীরেনদা ? মরণ আমাদের ধরবার আগে আমরাই কেন মরণকে এগিয়ে গিয়ে ধরি না ?"

বীরেনদা বললে, "একটু সবুর কর। আমি একবার জাহাজের উপরে গিয়ে দেখে আসি, কোন উপায় আছে কিনা !"

আমরা দুজনেই একসঙ্গে ব'লে উঠলুম, "তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব !"

—"না, না, তাহ'লে গোলমাল হবার সম্ভাবনা। আমি একলাই যাব।"

—"কিন্তু তুমি যদি বিপদে পড় ?"

—"তাহ'লে তোমরা দুজন থাকলেও কোন উপকার হবে না।"—এই ব'লে বীরেনদা দড়ীর সাহায্যে আবার উপরে উঠতে লাগল।

পনেরো মিনিট ! আধঘণ্টাও কেটে গেল বোধ হয়।

আমি বললুম, "অমিয়, এখনো বীরেনদার দেখা নেই !"

অমিয় বললে, "আমি যেন উপর থেকে মাঝে মাঝে কাদের হট্ট-গোলের শব্দও শুনতে পেয়েছি ! চল, আমরাও উপরে উঠি।"

—"না, আর-একটু দেখি। বীরেনদার কথা অমান্য করা উচিত নয়।"……

বোধ হয় আরো আধঘণ্টা গেল। তবু বীরেনদার দেখা নেই! আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল—নিজের কষ্টের কথা ভুলে গেলুম।

অমিয় বললে, "সরলদা, আর নয়—বীরেনদা নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছেন!"

আমি বললুম, "হ্যাঁ চল, আমরাও উপরে উঠি। এখানে এমন ক'রে মরার চেয়ে উপরে গিয়ে বীরের মতন মরা ঢের ভালো"—

আমার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই উপর থেকে একসঙ্গে আমাদের দুজনেরই দড়ীতে টান পড়ল, কারা যেন আমাদের উপরে টেনে তুলছে।

অমিয় বললে, "নিশ্চয় বীরেনদা আমাদের টেনে তুলচেন!"

আমি হতাশ ভাবে বললুম, "না অমিয়,—এ বীরেনদা নয়! দেখচ না, একসঙ্গে আমাদের দুজনেরই দড়ীতে টান পড়েচে, নিশ্চয়ই একজনের বেশী লোক দড়ী ধ'রে টানচে।"

—"তবে কি—"

—"হ্যাঁ, আর কোন সন্দেহ নেই,—বোম্বেটেরা আমাদের কথা টের পেয়েচে!"

—"আমরা যদি দড়ী ছেড়ে দি?"

—"সমুদ্রে ডুবে মরব।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নীলগোলাপের ছাপ

আমরা ক্রমেই উপরে উঠছি!—মানুষ ছিপের সুতোয় বেঁধে টেনে তোলবার সময়ে মাছ-বেচারাদের মনের ভাব যে-রকম হয়, আমাদেরও মনের অবস্থা তখন বোধ করি অনেকটা সেই-রকমই হয়েছিল!

নীচে অতল সমুদ্র যেন হাঁ ক'রে আছে—আমাদের গিলে ফেলবার জন্যে, আর উপরে প্রস্তুত হয়ে আছে বোম্বেটেদের নিষ্ঠুর তরবারী—আমাদের ধড় থেকে মুণ্ডটা তফাৎ ক'রে ফেলবার জন্যে!

অমিয় বললে, "সরলদা, এস আমরা দড়ী ছেড়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি!"

আমি হতাশ ভাবে বললুম, "তাতে আর লাভটা কি হবে ভাই?"

—"বোম্বেটেরা তো আমাদের ধরতে পারবে না!"

—"কিন্তু সমুদ্রের গ্রাস থেকেই বা বাঁচব কেমন ক'রে? এ তো আর পুকুর কি নদী নয়, যে সাঁতার দিয়ে পার হয়ে যাব!"

—"কিন্তু ছোরা-ছুরির খোঁচা খেয়ে মরার চেয়ে কি ঠাণ্ডা জলের তলায় তলিয়ে যাওয়া ঢের ভালো নয়?"

ততক্ষণে আমরা জাহাজের ডেকের কাছে এসে পৌঁছেছি!

—চার-পাঁচজন লোক উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে সাগ্রহ ভাবে আমাদের দেখছে! একজনের হাতে লণ্ঠন, তারই আলোয় দেখলুম—

প্রত্যেকেরই নাক খ্যাঁদা আর চোখগুলো কুৎকুতে। তারা সকলেই চীনেম্যান!

অমিয় আবার ব'লে উঠল, "সরলদা! এখনো সময় আছে—দড়ী ছেড়ে দাও, এদের হাতে পড়ার চেয়ে ডুবে মরা ভালো!"

সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে বীরেনদার গলার আওয়াজে শুনলুম, "না অমিয়, দড়ী ছেড়োনা! তোমরা উপরে উঠে এস!"

বীরেনদা বেঁচে আছে! আমাদের উপরে যেতে ডাকছে! বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলুম!

বীরেনদার গলা পেয়ে অমিয় আর ইতস্তত করলে না, চট্‌পট্‌ দড়ী বয়ে তখনি ডেকের উপরে গিয়ে উঠল!...আমিও তাই করলুম।

উপরে গিয়ে দেখলুম, অদ্ভূত দৃশ্য! পঁচিশ-ত্রিশ জন লোক আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের সকলেই প্রায় চীনেম্যান, তবে তিন-চার জন কালো চেহারার লোকও দলের ভিতরে ছিল—দেখলে তাদের ভারতবাসী ব'লেই মনে হয়!

বীরেনদা দাঁড়িয়ে আছে বুক ফুলিয়ে তাদের মাঝখানে—নিজের দীর্ঘ দেহ নিয়ে, সকলের মাথার উপরে মাথা তুলে! বীরেনদার মাথায় একখানা কাপড় জড়ানো—কাপড়খানা রক্তে রাঙা। তার জামা-কাপড়ও স্থানে স্থানে ছিঁড়ে গিয়ে দেহের লোহার মত কঠিন মাংস-পেশীগুলো প্রকাশ ক'রে দিয়েছে! দেখেই বুঝলুম, বীরেনদার সঙ্গে বোম্বেটেদের বিলক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়ে গেছে!

অন্যান্য মুখগুলোর উপরেও তাড়াতাড়ি একবার চোখ বুলিয়ে গেলুম —সে সব মুখের উপরে সয়তানি আর পশুত্বের ছাপ্ সুস্পষ্ট, তারা ভুলেও

যে কখনো দয়া-মায়ার স্বপন দেখেছে, এমন কথা কল্পনাও করা যায় না। আমাদের দিকে তারা তাকিয়ে আছে—যেমন ক'রে তাকায় ইঁদুরের দিকে বিড়ালরা!

অমিয় বললে, "বীরেনদা, তোমার মাথায় কি হয়েচে?"

বীরেনদা দু পা এগিয়ে এসে, তার পিঠ চাপড়ে হেসে বললে, "ও কিছু নয় ভাই, সব কথা পরে বলব!"

আমি বললুম, "কিন্তু এরা আমাদের টেনে তুললে কেন? খুন করবার জন্যে?"

—"এ প্রশ্নেরও উত্তর পরে পাবে।"

—"কিন্তু এরা আমাদের নিয়ে যা-খুসি করুক, আপাততঃ আমাদের একটু জল দিক্—তেষ্টা আর সইতে পারচি না। মরতে হয় তো, দানাপানী খেয়ে একটু জিরিয়েই মরব!"

বীরেনদা ফিরে একটু গলা তুলে বললে, "কং-হিং! তোমরা কি আমার বন্ধুদের একটু জল দেবে না?"

একটা চীনেম্যান দলের একজনকে কি বললে—সে তখনি চ'লে গেল, বোধ হয় জল আনতেই।

আমি সবিস্ময়ে বললুম, "হ্যাঁ বীরেনদা, তোমার বাংলা কথা এরা বুঝতে পারলে?"

বীরেনদা কোন জবাব না দিয়ে একদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল, চারজন চীনেম্যান একটা বড় ভারি পিপে তোলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না!

বীরেনদা মৃদুস্বরে বললে, "সরল। অমিয়! তোমরা দুজনে ঐ লোক-গুলোকে সরিয়ে পিপেটাকে উপরে তুলে রেখে এস তো!"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন বীরেনদা?"

—"ওদের এই সুযোগে দেখিয়ে দাও তোমাদের গায়ের জোরটা। তা'হলে তোমাদের উপরে এদের শ্রদ্ধা বাড়বে—কারণ এ-সব লোক শ্রদ্ধা করে সুধু শক্তিকে।"

আমরা এগিয়ে গেলুম! যে-চারজন লোক পিপেটাকে নিয়ে টানা-টানি করছিল, বারংবার বিফল চেষ্টার পর তারা তখন পিপে ছেড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিল!

আমরা দুজনে পিপের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। ইসারায় জিজ্ঞাসা করলুম, "পিপেটাকে কোথায় তুলে রাখতে হবে?"

লোকগুলো বিরক্তি-ভরা মুখভঙ্গি ক'রে আমাদের পানে হিংস্র চোখ তুলে তাকালে, একটা লোক অত্যন্ত তাচ্ছীল্যের সঙ্গে পাশের একটা উঁচু জায়গা দেখিয়ে দিলে।

আমি আর অমিয় খুব সহজভাবে ও অনায়াসেই পিপেটাকে তুলে যথাস্থানে স্থাপন করলুম।

চারিদিকে বিজাতীয় ভাষায় অস্ফুট ধ্বনি উঠল। বোধ হয় সকলে আমাদের বাহবা দিচ্ছিল,···কারণ ফিরে দেখি, সকলেরই বিস্ময় ও সম্ভ্রম ভরা দৃষ্টি আমাদের দিকে আকৃষ্ট!

বীরেনদা বললে, "এখন এদের কাছে তোমাদের 'প্রেষ্টিজ' অনেক বেড়ে গেল। ভবিষ্যতে তোমাদের সঙ্গে লাগবার আগে এরা ভাববে। ···ঐ নাও, তোমাদের জল এসেচে।"

আমরা দু-জনে সাগ্রহে গেলাসের পর গেলাস ভ'রে জলপান করলুম! জল যে এত মিষ্টি লাগে, এর আগে তা জানতুম না!

বীরেনদা চেঁচিয়ে বললে, "কিং হিং! এখন তোমাদের সর্দ্দার আমাদের নিয়ে কি করতে চান?"

কং-হিং হচ্ছে একজন আধ-বুড়ো লোক, একমাত্র তারই মাথায় চীনাদের সেই বারো-হাত কাঁকুড়ের তেরো-হাত বীচির মতন পুরাতন ও সুদীর্ঘ টিকি, কুণ্ডলী-পাকানো সাপের মত জড়ানো রয়েছে। বীরেনদার কথা শুনে কং-হিং তার পার্শ্ববর্ত্তী একটা চীনেম্যানের কাণে কাণে কি বললে।

বীরেনদা চুপি চুপি বলেল, "কং-হিং যার সঙ্গে কথা কইচে, ঐ হচ্ছে বোম্বেটেদের সর্দ্দার। ওর নাম চ্যাং-চুং-চ্যাং।"

চ্যাং একটা পিপের উপরে ব'সেছিল, কং-হিং ছাড়া আর সব বোম্বেটেই তার কাছ থেকে সসম্ভ্রমে তফাতে দাঁড়িয়ে আছে। চ্যাং বয়সে চল্লিশের কাছাকাছি—দেহেও খুব প্রকাণ্ড। দেহ দেখলেই বোঝা যায়, তার গায়ে বুনো মহিষের মতন শক্তি আছে। পরে শুনেছি, কেবল চাতুর্য্যের জন্যে নয়, সে সর্দ্দার হ'তে পেরেছে তার এই আসুরিক গায়ের জোরেই। চ্যাঙের ডান চোখ কাণা। ডান চোখের ঠিক উপরেই কপালে একটা কাটা দাগ দেখে আন্দাজ করলুম, কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামাতেই চোখটি সে খুইয়েছে। চীনেদের প্রায়ই গোঁফ থাকেনা, চ্যাঙের কিন্তু গোঁফ আছে। আর সে গোঁফের মতন গোঁফই বটে, কারণ সেই গোঁফজোড়া একেবারে তার বুকের উপর পর্য্যন্ত গল্দা-চিংড়ীর দুটো বড় বড় দাড়ার মতন ঝুলে পড়েছে! ডান-হাতে লম্বা

একটা চণ্ডুর পাইপ নিয়ে চ্যাং কথা কইতে কইতে সোঁ সোঁ ক'রে ধোঁয়া টানছিল আর ছাড়ছিল। তার সেই কাটা কপাল, সেই কাণা চোখের গর্ত্ত, সেই জাঁদ্রেলী গোঁফ আর সেই বিরাট দেহ দেখলে মনের ভিতরে সত্য সত্যই একটা বিভীষিকার ভাব জেগে ওঠে! মনে হয় এ লোক কারুর কাছে কখনো দয়া চায় নি, কারুকে কখনো দয়াও করেনি!

কং-হিং দু পা এগিয়ে এসে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "নীলগোলাপের ছাপ্! নীলগোলাপের ছাপ! বাবু, তোমাদের নীলগোলাপের ছাপ নিতে হবে!"

বীরেনদার দিকে চেয়ে দেখলুম, সে দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল, তারপর একটা মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে ব'লে উঠল, "নাঃ, তা ছাড়া আর উপায় নেই—তা ছাড়া আর উপায় নেই!"

আমি উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, "নীলগোলাপের ছাপ কি বীরেনদা?"

—"আমাদের হাতে বোম্বেটেদের দলের চিহ্ন দেগে দেবে। এর পর আমারা যত দিন বাঁচব—এই অপমানের ছবি আমাদের হাতের ওপরে আঁকা থাক্‌বে। এ ছবি দেখলে লোকে আমাদের বোম্বেটে জেনে ঘৃণায় দূরে সরে যাবে।"

—"কিন্তু এ ছবি যদি আমরা হাতের উপর আঁকতে না দি?"

—"তাহ'লে এখনি আমাদের মরতে হবে।"

অমিয় বললে, "বোম্বেটে হব? তার চেয়ে এখনি পৃথিবী থেকে গোটাকয়েক বোম্বেটে কমিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া উচিত নয় কি?"

বীরেনদা বললে, "না অমিয়, আমরা যে বোম্বেটে হব না, এটা একেবারে ঠিক কথা।"

—"তবে এই চিহ্ন আমাদের হাতে দেগে দেবে কেন?"

—"ওরা অবশ্য জানবে যে, আমরা ওদেরই দলের লোক। কিন্তু আমরা যে ওদের লোক কখনোই হব না, সে-বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই! আর ওদেরও সেই সন্দেহ আছে ব'লেই আমাদের ওরা একেবারে মার্কা-মারা ক'রে ছেড়ে দিতে চায়।"

—"কিন্তু আমাদের দলে নেবার জন্যে ওদের এতটা উৎসাহ কেন?"

—"ওদের উৎসাহ কেন? আমার সব কথা শুনলেই পরে তোমরা বুঝতে পারবে। ঐ নীলগোলাপের ছাপ আমাদের হাতের ওপরে দেগে দিয়ে ওরা আমাদের বেঁধে রাখতে চায়! কারণ এর পরেও আমরা যদি ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করি, তাহ'লে ওরাও আমাদের ধরিয়ে দিতে পারবে। এই বিখ্যাত নীলগোলাপের ছাপ সব দেশের পুলিশই চেনে। যারই হাতে এই ছাপ থাকে তারই একমাত্র দণ্ড হচ্ছে প্রাণদণ্ড। * * এখন প্রস্তুত হও। ঐ দেখ, ওরা আমাদের দিকে এগিয়ে আস্‌চে। এইবার আমাদের নীলগোলাপের ছাপ নিতে হবে—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "অর্থাৎ এইবার আমাদের বোম্বেটে হ'তে হবে?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

'মানোয়ারি' জাহাজ

হাতের উপরে আমরা নীলগোলাপের ছাপ্ নিয়েছি !—একটা মড়ার মাথার উপরে গোলাপ ফুটে আছে—সমস্তটাই নীল রঙের উল্কীতে আঁকা ! এ ছাপ্ আমাদের হাতে দেখলে সাধুরা ভয়ে পালিয়ে যাবে, পুলিস আমাদের পিছনে তাড়া করবে !

চোখের সামনে ফাঁশীকাঠের স্বপন দেখতে দেখতে নিজেদের কামরায় ফিরে এলুম।

অমিয় প্রথমেই বললে, "বীরেনদা, আগে তোমার গল্প শুনব।"

বীরেনদা যা বললে, তা হচ্ছে এই :—"ভাই, অতক্ষণ পানাহার না ক'রে জলের ভিতরে ভাস্তে ভাস্তে আমার সর্ব্বশরীর যে নেতিয়ে প'ড়েছিল, সে কথা স্বীকার না করলে মিথ্যা কথা বলা হবে। সত্যিই আমার ভারি কষ্ট হচ্ছিল ! * * কিন্তু সে কষ্টও আমাকে তত ব্যথা দিচ্ছিল না, যত ব্যথা পাচ্ছিলুম তোমাদের কাৎরানি আর ছট্‌ফটানি দেখে। একে তো তোমাদের আমি ছোট ভাইয়ের মতন ভালোবাসি, তার উপরে আমার পরামর্শ শুনেই তোমরা প্রাণ দিতে বসেছ। কাজেই যাতনায় আর অনুতাপে প্রাণ আমার ফেটে যাবার মত হ'ল। মনে মনে পণ করলুম, প্রাণ তো যেতেই বসেছে, তবু তোমাদের জন্যে একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখব। তাই তোমাদের ভরসা দিয়ে আমি কাছি ধ'রে আবার জাহাজের উপরে গিয়ে উঠলুম।

কিন্তু চেষ্টা ক'রেও কিছু যে ফল হবে, সে আশা আমার ছিল না মোটেই। তবু ডুবে মরবার সময়ে মানুষ খড়ের কুটোও জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করে—আমার এ চেষ্টাও অনেকটা তারই মত। মরব যখন নিশ্চয়ই, মরার ভয়ও ছিল না! তখন আমি মরিয়া। পাগ্‌লা হাতীর সাম্‌নে গিয়েও বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারি অনায়াসে। মনে মনেই বললুম, "এখন আমার সুমুখে যে এসে দাঁড়াবে নিতান্তই তাকে যমে টেনেছে!"

জাহাজের কোন্ ঘরে খাবার আর জল থাকে, তা আমি জানতুম। রাতও হয়েছে, শত্রুরও ভয় নেই। সুতরাং বোম্বেটেরা হয়তো এখন যে যার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে, এম্‌নি-একটা আন্দাজও আমি ক'রে নিলুম।

পা টিপে টিপে গুড়ি মেরে এগুতে লাগলুম,—জীবনে এত নিঃশব্দে আর কখনো আমি অগ্রসর হই নি! চোখের উপরে ভেসে উঠছে বারংবার তোমাদের কাতর মুখ এবং বারংবার মনে হচ্ছে, তোমাদের মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে, আমার সফলতার উপরেই।.........আজ যদি খাবার আর জল জোগাড় করতে পারি, তাহ'লে আমাদের সকলেরই প্রাণ বাঁচবে। তারপর জাহাজ কোন বন্দরে গিয়ে লাগ্‌লেই আমরা ডাঙায় উঠে স'রে পড়তে পারব।

জাহাজের ভাঁড়ার-ঘরের কাছে এসে পড়লুম, কেউ আমাকে দেখতে পেলে না। আসতে আসতে অনেক কামরার ভিতর থেকেই শুনতে পেলুম, মানুষের নাক-ডাকার আওয়াজ!

কিন্তু ভাঁড়ার-ঘরের সাম্‌নে গিয়েই দেখলুম, একটা লোক দেওয়ালে

ঠেসান্ দিয়ে ব'সে ঘুমোচ্ছে না বটে, কিন্তু ঢুলছে। নিশ্চয়ই প্রহরী !

জাহাজের মেঝের উপরে শুয়ে পড়লুম। তারপর ধীরে ধীরে এগুতে লাগলুম, সাপের মতন বুকে হেঁটে।

প্রায় যখন তার কাছে গিয়ে পড়েছি, হঠাৎ সে অকারণেই মুখ তুললে ; এবং চোখ খুললে ; এবং বলা বাহুল্য, আমাকে দেখতেও পেলে !

একলাফে সে দাঁড়িয়ে উঠল—একলাফে আমিও দাঁড়িয়ে উঠলুম। সে নিজেকে সাম্‌লাবার আগেই দু-হাতে প্রাণপণে তাকে জড়িয়ে ধরলুম। লোকটা বিকট আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল—সেই তার শেষ-আর্ত্তনাদ ! কারণ পর-মুহূর্ত্তেই আমি নিজেই শুনতে পেলুম, আমার হাতের চাপে তার ঘাড়ের, পাঁজরার আর হাতের হাড় মড়্ মড়্ ক'রে ভাঙ্‌তে সুরু হ'ল—তার গলা দিয়ে আর একটি টু-শব্দও বেরুলনা ! লোকটাকে এমন ভাবে খুন করতে আমার মনে একটুও দরদ জাগ্‌লনা—এ সেই বোম্বেটেদেরই একজন, যারা কাল রাতে জাহাজের সমস্ত নিরীহ যাত্রীকে হত্যা ক'রে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছে। না পালালে আমরাও এতক্ষণ বেচে থাকতুম না।

চারিদিকে অনেক লোকের পায়ের শব্দ শুনে সেই হাড়গোড়-ভাঙা মড়াটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। তখন পালাবার উপায়ও ছিল না, পালাবার ইচ্ছাও রইল না। যে উদ্দেশ্যে এসেছি, তাও বিফল হ'ল,—মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী, তা এদের হাতেই হোক্ আর অনাহারে বা জলে ডুবেই হোক্ !

বিজয়া

আমি 'বক্সিং' জানি, 'যুযুৎসু' জানি, কুস্তি জানি। আর আমার গায়ে কি-রকম জোর আছে, কলকাতার পথে একদিন এক ক্ষ্যাপা ষোষের সঙ্গে লড়বার সময়েই তোমরা তা স্বচক্ষে দেখেছ! তার উপরে বলেছি তো আজ আমি মরিয়া আর বেপরোয়া! সুতরাং তারপরেই জাহাজে যে ব্যাপারটা ঘটল, আমার মুখে শুনলে তোমরা ছাড়া আর কেউ বোধ হয় তা বিশ্বাস করতে চাইবে না। তবে মুষ্টিযোদ্ধা আর 'যুযুৎসু'র পালোয়ানরা হয় তো আমার কথা অত্যুক্তি ব'লে মনে করবেন না। *

একসঙ্গে কত লোক যে আমাকে আক্রমণ করলে, তা আমি বুঝতে পারলুম না। তবে বিশ-পঁচিশ জনের কম নয় নিশ্চয়ই!

কিন্তু তারা আমাকে ধরতে পারলে না—আমি তাদের সে-সুযোগ দিলুম না। বিদ্যুতের মতন বেগে আমি একবার বাঁয়ে, একবার ডাইনে,—একবার সুমুখে, আর একবার পিছনে লাফিয়ে বা গুড়ি মেরে স'রে স'রে যেতে লাগলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতও চলতে লাগল ক্ষিপ্র-গতিতে এমন কৌশলে যে, খানিকক্ষণ পর্যান্ত তারা তো আমাকে ধরতে পারলে না বটেই, উল্টে তাদের দলের আট-দশ জন লোক আহত বা অজ্ঞান হয়ে মেঝের উপরে লুটিয়ে পড়ল এবং অনেকেই মার খেয়ে আর্ত্তনাদ করতে করতে পিছিয়ে গেল!

* বীরেনদার এ অনুমান সত্য। কারণ বছর চৌদ্দ-পনেরো আগে কলকাতায় চৌরঙ্গীর উপরে, একবার এক জাপানী 'যুযুৎসু'র পালোয়ান খালি হাতে একাকী উনিশ-বিশ জন লোককে হারিয়ে দিয়েছিল। সে সময়ে "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজে" ঐ ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। যাঁদের সন্দেহ হবে, তাঁরা উক্ত ইংরেজী সংবাদপত্রের পুরাণো ফাইল' খুলে দেখতে পারেন। ইতি।

ক্রমেই তাদের দলে লোক বাড়তে লাগল এবং আমিও হাঁপিয়ে পড়লুম। আর বেশীক্ষণ এমন অসমান লড়াই নিশ্চয়ই আমি চালাতে পারতুম না,—কিন্তু বোম্বেটেরা আমার শক্তি দেখে অবাক্ হয়ে নিজেরাই দূরে স'রে গিয়ে হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে পড়ল!

এবং সেই অবসরে আমি পিঠ থেকে বন্দুকটা খুলে নিয়ে ডান হাতে লাঠির মত বাগিয়ে ধ'রে, আর বাঁ-হাতে রিভলভারটা বার ক'রে বোম্বেটেদের দিকে তুলে ইংরেজীতে চেঁচিয়ে বললুম, "দেখচ, গায়ের জোরেও আমি শিশু নই, আর আমার হাতে অস্ত্রেরও অভাব নেই? যদি মরবার সাধ থাকে, তবে এগিয়ে এস!"

বোম্বেটেদের মধ্য হ'তে একটা ভয়ের কাণাকাণি উঠল,—এগুবে কি, তারা আরো পিছনে হ'টে গেল! আচম্বিতে একটা লোক ভিড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বাংলা ভাষায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কি বীরুবাবু?"

এমন জায়গায় একটা চীনে-বোম্বেটের মুখে হঠাৎ বাংলা কথা আর —তার চেয়েও যা অসম্ভব—আমার নাম শুনে আমি তো একেবারে থ হয়ে গেলুম!

তখন জাহাজের চারিদিকে অনেক আলো জ্ব'লে উঠেছিল। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা সাম্‌লে, ভালো ক'রে চেয়ে দেখেই লোকটাকে চিনতে পারলুম। তার নাম কং-হিং, কলকাতায় অনেক দিন ধ'রে একটা জুতোর দোকান চালিয়েছিল। সর্ব্বদাই সে হাস্‌ত—তার মুখের হাসি কখনো শুকোতে দেখি-নি। ছেলেবেলা থেকেই ফি বছরে তার দোকানে গিয়ে আমি অনেক জুতো কিনেছি। তার দোকানের

জুতো নইলে আমার পছন্দ হ'ত না। সে বেশ বাংলা জানত আর আমার সঙ্গে তার খুব জানাশোনাও ছিল। কিন্তু আজ বছর-দুই আগে সে দোকানপাট তুলে কলকাতা থেকে অদৃশ্য হয়েছিল। তারপর আজ হঠাৎ তার দেখা পেলুম অপার সাগরের ভিতরে, এই বোম্বেটেদের দলে।

আমি বললুম, "আরে, কং-হিং সায়েব যে! তা'হলে আজকাল দেখচি জুতো-শেলাই ছেড়ে তুমি মানুষের গলা-কাটা ব্যবসা সুরু করেচ? বেশ, বেশ! কিন্তু দেখ্‌চ, আমার গলা কাটা কত শক্ত?"

কং-হিং হা-হা ক'রে হেসে উঠল এবং তার হাসি নীরব হবার আগেই ভিড় ঠেলতে ঠেলতে আর-একজন লম্বা-চওড়া জোয়ান বাইরে এসে দাঁড়াল। এতক্ষণ তাকে দলের ভিতরে দেখি-নি, সে বোধ হয় কামরার ভিতরেই ছিল। পরে শুনলুম তার নাম চ্যাং-চুং-চ্যাং—বোম্বেটেদের সর্দ্দার।

যে-লোকগুলো জখম হয়ে চারিদিকে গড়াগড়ি দিচ্ছিল তাদের উপরে এক চক্ষু বুলিয়ে, চ্যাং বিস্মিত ভাবে অল্পক্ষণ আমার পানে মিটির-মিটির ক'রে চেয়ে রইল। তারপর কং-হিংয়ের দিকে ফিরে খোনা-গলায় কি যেন জিজ্ঞাসা করলে।

কং-হিং চীনে-ভাষায় তাকে কি বলতে লাগল আর চ্যাংও তাই শুনতে শুনতে বার বার প্রশংসা-ভরা চক্ষে আমার দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে আর নিজের বুক-পর্য্যন্ত-ঝুলে-পড়া লম্বা গোঁফের উপরে হাত বুলোতে লাগল। কং-হিংয়ের কথা শেষ হবার পর চ্যাং গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ কি ভাবলে। তারপর কং-হিংকে আবার কি বললে।

কং-হিং আমার দিকে ফিরে বললে, "বীরুবাবু, তুমি অস্ত্র নামাও। আমাদের সর্দ্দার তোমার বীরত্ব দেখে ভারি খুসি হয়েছেন।"

আমি বললুম, "কিন্তু তোমাদের কথায় বিশ্বাস কি? আমি অস্ত্র নামালে তোমরা যদি আবার আমাকে আক্রমণ কর?"

কং-হিং হেসে বললে, "বীরুবাবু, আমরা ইচ্ছে করলে কি তোমাকে এখনো মেরে ফেলতে পারি না? আমাদের লোকেরা তাড়াতাড়িতে সুধু-হাতে বেরিয়ে এসেচে বটে, কিন্তু তারা যদি এখন সবাই মিলে বন্দুক নিয়ে এসে ফের তোমাকে আক্রমণ করে—"

বাধা দিয়ে আমি বললুম, "কিন্তু তার আগেই আমিও যে এখনি তোমাদের সর্দ্দারকে গুলি ক'রে মেরে ফেলতে পারি!...তবে ঝগড়ার কথা থাক্। আমি অস্ত্র রাখচি, তুমি কি বলতে চাও, বল।"

কং-হিং আমার কাছে এসে বললে, "বীরুবাবু, খালি বীরত্বের জন্যে নয়, আমার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব ছিল ব'লেই এ-যাত্রা তুমি বেঁচে গেলে! আমি হচ্ছি চ্যাংয়ের দাদা। চ্যাং সর্দ্দার হ'লেও আমাকে মান্য করে। আজ থেকে তুমিও আমাদের দলের একজন হ'লে—তোমার মতন লোক পেলে আমাদের অনেক উপকার হবে। কেমন, তুমি রাজি আছ তো?"

ভাবলুম, বলি, না!—ভদ্রলোকের ছেলে, বোম্বেটে হব?—কিন্তু তার-পরেই মনে হ'ল শঠের সঙ্গে শঠতা করতে দোষ কি? আপাতত তাদের কথায় রাজি হয়ে প্রাণ বাঁচাই তো, তারপর সুবিধা পেলেই চম্পট দেওয়া যাবে!

চালাক কং-হিং হাসতে হাসতে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে আমার মুখের ভাব লক্ষ্য

করছি। আমার মনের কথা সে বোধ হয় কতকটা আন্দাজ করতে পারলে। কারণ সে বললে, "হ্যাঁ বীরুবাবু, আর এক কথা। আমাদের দলে এলে তোমাকে নীলগোলাপের ছাপ্ নিতে হবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "সে আবার কি?"

—"আমাদের দলের চিহ্ন। এ চিহ্ন তোমার হাত থেকে কখনো উঠবে না। এ চিহ্ন হাতে থাকতে আমাদের দলের লোক আর বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রে ফাঁকি দিতে পারে না। কারণ দল ছাড়লেই তারা পুলিসের হাতে গিয়ে পড়ে—অর্থাৎ আমরাই তাকে ধরিয়ে দি। পুলিসও যার হাতে ঐ চিহ্ন দেখে, তার কোন কথা বিশ্বাস করে না।"

কিন্তু তখন আমি মন স্থির ক'রে ফেলেছি, কং-হিংয়ের এই ভীষণ কথা শুনেও নিশ্চিন্ত ভাবে বললুম, "আমি তোমাদের কথায় রাজি আছি —যদি আমার আরো দুজন সঙ্গীকেও তোমাদের দলে নাও।"

কং-হিং বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বললে, "তোমার আরো দুজন সঙ্গী! কোথায় তারা?"

আমি তাকে আমাদের সকলকার সব কথা সংক্ষেপে জানিয়ে দিলুম।

কং-হিং চিন্তিত ভাবে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে, "তবেই তো! সর্দ্দার বোধ হয় রাজি হবে না।"

আমি বললুম, "কং-হিং সায়েব, আমার বন্ধুদেরও পেলে তোমাদের দলের জোর বাড়বে! তাদের গায়েও জোর বড় কম নয়! আর তাদের যদি দলে না নাও, আমাকেও তোমরা পাবে না। তা'হলে আমরা তিন-জনেই তোমাদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে মরব - মরতে আমরা কেউ ভয় পাই না। বল, তাহ'লে আমার বন্ধুদের ডাকি, আর ফের অস্ত্র ধরি?"

মাথার উপরে পাকানো টিকি-খোঁপার উপরে হাত বুলোতে বুলোতে কং-হিং আবার চ্যাঙের কাছে ফিরে গেল, আবার তাদের তুজনের ভিতরে কি পরামর্শ হ'ল। তারপর কং-হিং আবার আমার কাছে হাসিমুখে ফিরে এসে বললে, "আমার এই পয়মন্ত টিকির জয় হোক্! আজ দেখচি তোমাদের অদৃষ্ট খুব ভালো। সর্দ্দারকে রাজি করেছি!"

সরল, অমিয়, তারপরের কথা সব তোমরা জানো!"

বীরেনদার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বাইরে বিষম একটা হৈ-চৈ উঠল! চম্‌কে চেয়ে দেখি, ইতিমধ্যে কখন রাত পুইয়ে গেছে আমরা কেউ তা খেয়ালে আনি নি—জানলা দিয়ে নীলাকাশ-থেকে-ঝ'রে-পড়া সকালের সাদা আলো কাম্‌রার ভিতরটা পর্য্যন্ত উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে এবং বাইরে বোম্বেটেরা ব্যস্তভাবে চীৎকার আর ছুটোছুটি করছে!

ব্যাপার কি জানবার জন্যে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম।

দেখলুম, চ্যাং আর কং-হিং দূরবীণ চোখে দিয়ে যেদিক থেকে সূর্য্যোদয় হচ্ছে সেইদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কাঠের পুতুলের মত নিস্পন্দ হয়ে!

বীরেনদা সুধোলে, "এত সকালে দূরবীণ চোখে দিয়ে কি দেখ্‌চ কং-হিং সায়েব?"

দূরবীণটা চোখ থেকে নামিয়ে কং-হিং হাসিমুখেই বললে, "মানোয়ারি জাহাজ!"

—"মানোয়ারি জাহাজ?"

—"হ্যাঁ বীরুবাবু! ও জাহাজে গোরা আছে, কামান আছে। ওরা আমাদেরই ধরতে আস্‌চে!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তিন-পাহাড়ী দ্বীপ

মানোয়ারি জাহাজ আসছে আমাদের আক্রমণ করতে?

কথাটা শুনে সুখী হব, কি দুঃখিত হব, আমি তা বুঝতে পারলুম না—অবাক্ হয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলুম, যেখানে হুস্ হুস্ ক'রে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একখানা জাহাজ ক্রমেই দেখতে-বড় হয়ে উঠছে!

অমিয় খুসিমুখে বললে, "এইবার আমরা মুক্তি পাব।"

আমি বললুম, "আমরা মুক্তি পাব না অমিয়! আমাদের বিপদ বরং আরো বেড়ে উঠল!"

—"কেন সরলদা, আমাদের আবার বিপদ কিসের? আমরা তো আর বোম্বেটে নই!"

—"কিন্তু আমাদের হাতে যে নীলগোলাপের মার্কা মারা আছে! আমরা যে বোম্বেটে নই, ওরা তা বিশ্বাস করবে কেন?"

—"আমরা সব কথা খুলে বলব, আমরা—"

বাধা দিয়ে বললুম, "সে আর হয় না অমিয়! এই বোম্বেটেদের সঙ্গে ধরা পড়লে আমাদের আর কিছুতেই বাঁচোয়া নেই!"

অমিয়ের খুসিমুখ আবার ম্লান হয়ে পড়ল! সে বোম্বেটের মতন মরতে চায় না!

এমন সময়ে চ্যাং চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে চীনে-ভাষায় চেঁচিয়ে কি-একটা হুকুম দিলে।

ডেকের উপর কলরব তুলে বোম্বেটেরা চারিদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল। এবং দেখতে দেখতে আমাদের জাহাজের গতি বেড়ে উঠল!

কং-হিং আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল। মাথায় টিকির কুণ্ডলীর উপরে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, "বীরুবাবু, তোমার মনে বোধ হয় খুব ভয় হয়েচে?"

বীরেনদা বললে, "হ্যাঁ, ভয় হচ্ছে বটে,—তবে প্রাণের ভয় নয়, অপমানের ভয়!"

—"তার মানে?"

—"আমরা বোম্বেটে না হয়েও বোম্বেটে ব'লে ধরা পড়ব, এটা কি আমাদের পক্ষে অপমানের কথা নয় কং-হিং?"

—"আমরা ধরা পড়ব কেন বীরুবাবু?"

—"আমরা যে ধরা পড়ব না কেন, তারও তো কোন কারণ দেখচি না। আমাদের পিছু নিয়েচে মানোয়ারি জাহাজ—আমাদের জাহাজের চেয়ে সে ঢের বেশী তাড়াতাড়ি এগুতে পারে। সুতরাং তাকে এড়িয়ে আমরা পালাতে পারব না। তারপর মানোয়ারি জাহাজে আছে দলে দলে গোরা, অগুন্তি বন্দুক আর কামান! সুতরাং লড়াই ক'রেও তার সঙ্গে আমরা এঁটে উঠতে পারব না।"

কং হিং হেসে বললে, "তোমাদের কথা ঠিক বীরুবাবু। মানোয়ারি জাহাজ আমাদের পক্ষে যমের মতই বটে। কিন্তু তবু আমরা তাকে কলা দেখিয়ে পালাতে পারব। এদিকে এসে দেখে যাও"—এই ব'লে সে

বীরেনদাকে হাত ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে চলল, আমরা দুজনেও তাদের পিছনে পিছনে অগ্রসর হলুম।

এতক্ষণ আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম, সেখান থেকে জাহাজের অন্য পাশের সমুদ্রের দৃশ্য কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এখন এপাশে এসে দাঁড়িয়ে দেখি, এ কি অভাবিত ব্যাপার!

আমাদের চোখের সামনে, মাইল-কয়েক দূরে জেগে উঠেছে একটি পরমসুন্দর অরণ্যশ্যামল দ্বীপের ছবি—তার মাথার উপরে আকাশের নীলপটে আঁকা রয়েছে পাশাপাশি তিনটি পাহাড়ের ধূসর চূড়া!

দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল—মনে হ'ল এই বিপদসঙ্কুল পাথারে সেইই যেন আমাদের একমাত্র মুক্তির নীড়!

কং-হিং হাসতে হাসতে বললে, "এখন বুঝচ তো বীরুবাবু, কেন আমরা ধরা পড়ব না? একবার ঐ দ্বীপে গিয়ে উঠতে পারলে আর আমাদের হাতে-পায় কে?"

আমি বললুম, "কিন্তু কং হিং সায়েব, জাহাজী গোরারাও যে দ্বীপে উঠে আমাদের আক্রমণ করবে না, এতটা ভরসা তুমি করচ কেন?"

—"কী, দ্বীপে উঠে আমাদের আক্রমণ করবে? অসম্ভব, অসম্ভব! ওখানকার এমন সব লুকোবার জায়গা আমরা জানি যে, কেউ আমাদের টিকিটি পর্য্যন্ত দেখতে পাবে না।...জানো বীরুবাবু, ঐ দ্বীপে আসবার জন্যেই আমরা এই জাহাজ লুট করেচি?"

বীরেনদা একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "কেন, ঐ দ্বীপে আসবার জন্যে তোমাদের এতটা আগ্রহের কারণ কি?"

কং হিঙের দুই চোখ কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে বললে, "কারণ কি? কারণ—না, না, কোনই কারণ নেই—দেখিগে, ওদিককার ব্যাপারখানা!"—ব'লেই সে দ্রুতপদে প্রস্থান করলে।

কং হিঙের কথায় কেমন যেন রহস্যের আভাস পাওয়া গেল! ঐ দ্বীপেই ওরা যেতে চায়? ঐখানে যাবার জন্যেই ওরা এই জাহাজ লুট করেছে? এর একটা গুপ্ত কারণ আছে নিশ্চয়ই, অথচ সে কারণটা যে কি, কং হিং তা আমাদের কাছে প্রকাশ করলে না!

আমাদের জাহাজ উর্দ্ধশ্বাসে দ্বীপের দিকে ছুটতে লাগল, দ্বীপের গাছপালা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ওধারে গিয়ে দেখি, মানোয়ায়ারি জাহাজখানা আরো কাছে এসে পড়েছে—দুপাশে সমুদ্রের জল ফেনিয়ে তুলে।

ওদিকে চেয়ে দেখলুম, চ্যাং, কং হিং আর জনকয়েক চীনেম্যান একখানা কাগজের উপরে ঝুঁকে প'ড়ে ব্যস্তভাবে কি দেখছে আর পরামর্শ করছে। কাছে এগিয়ে গিয়ে বুঝতে পারলুম, কাগজখানা হচ্ছে দ্বীপের ম্যাপ।

জাহাজেরও চারিদিকেই মহা হুড়োহুড়ি প'ড়ে গেছে। পঁচিশ-ত্রিশজন লোক ক্রমাগত চীৎকার আর ছুটোছুটি করছে, কেবিন থেকে জিনিষ-পত্তর বাইরে টেনে আনছে, মোটমাট বাঁধছে। এ'সব যে জাহাজ ছেড়ে পালাবার উদ্যোগ, তা আর বুঝতে বিলম্ব হ'ল না।

আচম্বিতে গুড়ুম ক'রে একটা শব্দ হ'ল! চম্‌কে চেয়ে দেখি, মানোয়ারি জাহাজ থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে এবং একটা অগ্নিময় পিণ্ড আমাদের মাথার উপর দিয়ে হু হু ক'রে চ'লে যাচ্ছে!

গোরারা তোপ দাগছে! তারা বুঝতে পেরেছে যে, আমরা দ্বীপের দিকে পালাচ্ছি।

দ্বীপ তখন আমাদের কাছ থেকে মাইল-দু'য়েক তফাতে।

বোম্বেটেরা এদিকে-ওদিকে লুকিয়ে পড়ল, জাহাজের ডেকের উপরে দাঁড়িয়ে রইলুম খালি আমরা তিন বন্ধু, আর রইল চ্যাং, কং হিং আর তিনজন চীনেম্যান।

আবার গুড়ুম ক'রে আওয়াজ, কিন্তু এবারের গোলাটাও লক্ষ্যচ্যুত হয়ে আমাদের জাহাজের পাশ ঘেঁসে চলে গেল।

বীরেনদা বললে, "গতিক বড় সুবিধের নয়! চল, এইবেলা কেবিনে গিয়ে জিনিষ-পত্তরগুলো বেঁধে-ছেঁদে নি। বিপদ দেখলে আবার সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হবে।"

কেবিনের ভিতরে যখন ঢুকছি, তখন মানোয়ারি জাহাজ থেকে একসঙ্গে দুটো কামান গর্জ্জে উঠল! তারপরেই আমাদের জাহাজখানা কেঁপে উঠল এবং শব্দ শুনেই বুঝলুম, এবারের গোলা আর লক্ষ্যচ্যুত হয় নি!

তারপর ভিতর থেকে ক্রমাগত কামানের আওয়াজ, আমাদের জাহাজ ভাঙার শব্দ, মানুষের চেঁচামেচি আর কাৎরানি শুনেই বোঝা যেতে লাগল, মরণের আলিঙ্গন আমাদের চার পাশ ঘিরে এগিয়ে আসছে!

মোটমাট নিয়ে উপরে এসে দেখলুম, ভীষণ দৃশ্য! আমাদের জাহাজ আর চলছে না, গোলার চোটে তার ধোঁয়া ছাড়বার প্রকাণ্ড চোঙাদুটো উড়ে গেছে, তার ইঞ্জিন বন্ধ, তার সর্ব্বাঙ্গ ভগ্নচূর্ণ এবং ডেকের উপরে

রক্তের ঢেউ বইয়ে কয়েকটা মানুষের মৃতদেহ নিশ্চেষ্ট হয়ে আছে—কোথাও জ্যান্ত মানুষের চিহ্ন নেই !

মানোয়ারি জাহাজের তোপ তখনো ধোঁয়া আর আগুন উদ্গার করছে !

জাহাজের ওপাশে ছুটে গেলুম—কেউ কোথাও নেই !

হঠাৎ অমিয় সমুদ্রের দিকে আঙুল তুলে বললে, "দেখ, দেখ !"

সমুদ্রের বুকে দুখানা বড় বড় বোট ভাসছে—তার ভিতরে ঠেসাঠেসি ক'রে ব'সে আছে অনেকগুলো লোক ! বোট দুখানা ছুটেছে দ্বীপের দিকেই !

বীরেনদা বললে, "বোম্বেটেরা পালাচ্ছে !"

আমি বললুম, "কিন্তু আমাদের উপায় কি ? আসল বোম্বেটেরা তো পালালো, শেষটা ধরা প'ড়ে ফাঁসীকাঠে চড়ব আমরাই নাকি ?"—আমার কথা শেষ হতে-না-হ'তেই মানোয়ারি জাহাজের একটা গোলা আমাদের জাহাজ ডিঙিয়ে পড়ল গিয়ে বোম্বেটেদের একখানা বোটের উপরে !

বোটখানা তখনি ভেঙে দুখানা হয়ে গেল—মানুষগুলোও কে কোথায় ছিটকে পড়ল, কিছুই বুঝতে পারলুম না—কেবল শুনতে পেলুম, একটা মর্ম্মভেদী হাহাকারের একতান হা হা ক'রে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হ'য়ে সেই সীমাহারা সাগরের মাঝখানে কোথায় হারিয়ে গেল—অসহায়ের মত !—তেমন ভয়ানক কান্না আমি আর কখনো শুনিনি, আমার সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল !···হয়তো ও-নৌকোর জনপ্রাণীও আর বেঁচে নেই !

অন্য বোটের বোম্বেটেরা প্রাণপণে দাঁড় টানতে লাগল।

অমিয় বললে, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! চ্যাঙের গোঁফ আর কং হিঙের টিকি কোন্ বোটে উঠেচে, তাই ভাবচি।"

ইতিমধ্যে বীরেনদা কোথা থেকে তিনটে জীবন-রক্ষক 'জামা' সংগ্রহ ক'রে আনলে! এই জামা পরলে মানুষ জলে ডোবে না।

তাড়াতাড়ি পরামর্শ ক'রে আমরা তিনটে পিপে এনে তার ভিতরে আমাদের দরকারি জিনিষ-পত্তর পূরে, পিপেগুলোর মুখ এমন ভাবে বন্ধ ক'রে দিলুম, যাতে ভিতরে জল ঢুকবার পথ না থাকে। তারপর পিপে তিনটেকে দড়ী দিয়ে বেধে ফেললুম। স্থির হ'ল, এই পিপেগুলোকে সমুদ্রে ফেলে আমরাও জলে ঝাঁপ দেব। তারপর ভাসতে ভাসতে দড়ী ধ'রে পিপেগুলোকে টান্‌তে টান্‌তে দ্বীপে গিয়ে উঠব।

দ্বীপ এখন মাইল-খানেক তফাতে রয়েছে। তার তিন পাহাড়ের তলায় এমন নিবিড় অরণ্য স্থির হয়ে আছে যে, ভিতরের আর কোন দৃশ্য দেখবার উপায় নেই।

বীরেনদা গম্ভীর ভাবে বললে, "কেন জানিনা, আমার মনে হচ্চে যেন ঐ রহস্যময় অজানা দ্বীপের ভিতরে হাজার হাজার বিপদ আমাদের জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে! চ্যাঙের দল ঐ দ্বীপে যাবার জন্যেই এই জাহাজখানা দখল করেছিল। দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে ওখানেই যাবার জন্যে তাদের যখন এমন আগ্রহ, তখন ভিতরে নিশ্চয় কিছু রহস্য আছে। কিন্তু তাদের গুপ্তকথা তো জানা গেল না।"

অমিয় বললে, "বীরেনদা! সরলদা! আমাদের জাহাজ বোধ হয় ডুবে যাচ্ছে!"

সত্যিই তাই! জাহাজখানা ক্রমেই কাৎ হয়ে পড়ছে এবং তার লম্বালম্বি একটা দিক জলের ভিতরে অনেকখানি নেমে গিয়েছে!

ওদিকে মানোয়ারি জাহাজখানা জল কাট্‌তে কাট্‌তে খুব কাছে এসে পড়েছে। তার ডেকের উপরে দলে দলে গোরা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাও দেখতে পেলুম।

আর দেরি না! আমরা পিপে তিনটেকে দড়ীতে ঝুলিয়ে জলে নামিয়ে দিলুম এবং নিজেরাও নেমে আবার সেই সমুদ্রকেই আশ্রয় করলুম।

ভরসা স্থধু এই, এবারে আর অকূল পাথারে ভাসছি না—কূল রয়েছে আমাদের চোখের সাম্‌নেই জেগে স্বপ্নমায়ার মতন।

কিন্তু পিছনে রয়েছে জাহাজী গোরাদের সতর্ক দৃষ্টি! তাদের বন্দুকের গুলি এড়িয়ে তীরে গিয়ে উঠতে পারব কি?

সে-সময়ে আমাদের মনে যে ভাব লীলায়িত হচ্ছিল, কবিতার আকারে তা এই ভাবে বলা যায়:—

ডাক্‌চে মরণ, ডাক্‌চে কামান,
ডাক্‌চে সাগর পাগল-পারা!
ছুট্‌চে গোলা, ছুট্‌চে সাগর,
ছুট্‌চে দেহের রক্তধারা!
বাংলাদেশের শ্যাম্‌লা ছেলে
চল্‌চে আকাশ-বাতাস ঠেলে,
অবাক হয়ে দেখচে চেয়ে
সূর্য্য এবং চন্দ্র-তারা—

বিজয়া

ডাক্‌চে মরণ, ডাক্‌চে কামান,
ডাকচে সাগর পাগল-পারা।

বাংলাদেশের শ্যাম্‌লা ছেলে
মরণ-খেলায় হয়না সারা,
মৃত্যু তাদের বক্ষে নাচে,
চক্ষে তাদের অগ্নি-ঝারা।
মরিই যদি মর্‌ব জেগে,
বাজের মতন ভীষণ বেগে!
শিশুর মতন মর্‌চে তারা
ফুল-বিছানায় ঘুমোয় যারা—
ডাক্‌চে মরণ, ডাক্‌চে কামান,
ডাক্‌চে সাগর পাগল-পারা

আমরা যে চাই বৃহৎ মরণ!
—তা ছাড়া আর নেইকো চারা,
কেঁচোর মতন কে হবে রে,
জুতোর চাপে জীবনহারা!
টবের গোলাপ হয়ে মোরা,
রইব না রে ঘরে পোরা,

ছোট্ট ঝড়ে মর্‌ব না তো

  জড়িয়ে ধ'রে মাটির কারা—

ডাক্‌চে মরণ, ডাক্‌চে কামান,

  ডাক্‌চে সাগর পাগল-পারা।
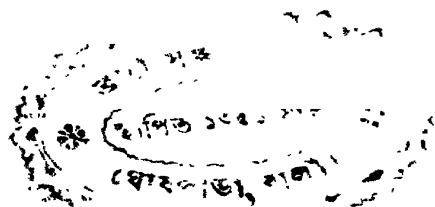
নবম পরিচ্ছেদ

অমানুষী দৃষ্টি

দ্বীপের দিকে ভাস্‌তে ভাস্‌তে চলেছি।

গায়ে জীবনরক্ষক সেই জামা ছিল, কাজেই জলের উপরে ভেসে থাকবার জন্যে আমাদের কোনরকম কষ্টই স্বীকার করতে হ'ল না। প্রত্যেকেই এক-একটা পিপে পিছনে টানতে টানতে খুব সহজেই জল কেটে দ্বীপের দিকে এগিয়ে চললুম!

বোম্বেটেদের নৌকোখানা দ্বীপের খুব কাছেই গিয়ে পড়েছে। মানোয়ারি জাহাজের গোলা এখনো তাদের পিছু ছাড়েনি বটে, কিন্তু এ-যাত্রা আর তাদের ধরতে পারবে না বোধ হয়।

মানোয়ারি জাহাজের দিকে চেয়ে দেখলুম, তার উপর থেকেও একখানা বোট নামানো হচ্ছে। তাহ'লে গোরারাও সহজে ছাড়বে না দেখছি—তারাও বোধ হয় দ্বীপে আসবার বন্দোবস্ত করছে!

আমি বললুম, "আরো শীগ গির—আরো শীগ্‌গির স াঁৎরে চল, নইলে আমরাই আগে ধরা পড়ব!"

বীরেনদা বললে, "ওঃ, এই নীলগোলাপের ছাপ! এর জন্যেই তো এত ভয়! নইলে কি এমন ভীরুর মতন আমরা পালাতুম?"

অমিয় বললে, "হ্যাঁ বীরেনদা, এমন ক'রে পালাতে আমার মাথা যেন কাটা যাচ্ছে!"

আমি বললুম, "কিন্তু লজ্জা কিসের অমিয়? আমরা তো আজ প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছি না, আমরা পালাচ্ছি মানের দায়ে!"

অমিয় বললে, "আচ্ছা, গোরারা যদি আগে আমাদেরই ধরতে আসে?"

আমি বললুম, "আমরা ধরা দেব না। আমরা লড়াই করব—"

বীরেনদা বললে, "হ্যাঁ, পৃথিবী থেকে অন্তত গোটাকয় কটা-চামড়ার মানুষ কমিয়ে তবে আমরা মরব, আমাদের এই কালো-চামড়ার মর্য্যাদা আমরা নষ্ট করব না—কিছুতেই না!"

আমি বললুম, "কিন্তু বীরেনদা, ওরা যদি আমাদের বন্দী করে,—ওরা যদি আমাদের মরতে না দেয়?"

বীরেনদা অট্টহাস্য ক'রে ব'লে উঠল, "মরতে দেবে না? যে মরতে চায়, তাকে মরতে দেবে না? যে বাঁচতে চায়, মৃত্যু তাকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে যায়—"

বাধা দিয়ে আমি বললুম, "কিন্তু যে মরতে চায় মৃত্যু তাকে সহজে গ্রহণ করে না, এইটেই তো আমি নিত্যি দেখতে পাই!"

—"মৃত্যু তো কাপুরুষকে গ্রহণ করে না সরল! দুনিয়ার সব আশা হারিয়ে, জীবনের দুঃখ এড়াবার জন্যে মরণকে যারা চায়, মৃত্যু যে তাদের ঘৃণা করে!……ঐ দেখ, মৃত্যু আমাদের দিকে ছুটে আসচে!"

অনেকগুলো বন্দুকের শব্দ—সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চারপাশ দিয়ে সোঁ সোঁ ক'রে হাওয়া কেটে অনেকগুলো গুলি চ'লে গেল! গোরারা আমাদেরও দেখতে পেয়েছে!

অমিয় চীৎকার ক'রে গেয়ে উঠল,
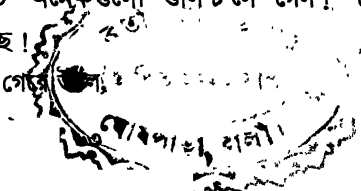
"মর্‌ব, মর্‌ব, মর্‌ব মোরা,
মর্‌তে মোরা ভালোবাসি !
মরণ-খেলা খেল্‌তে সুখে
আমরা যে ভাই ধরায় আসি !
আয় রে ছুটে মাটির ছেলে,
কাপুরুষের ভাব্‌না ফেলে,
জীবন তোদের পোকার জীবন—
কাঁদন-ভরা তোদের হাসি—
মরণ নিয়ে তাই তো খেলি,
মরতে মোরা ভালোবাসি !"

বীরেনদা বললে, "কিন্তু এ ভাবে মরা তো হবে না ভাই ! পিপে-গুলোকে ঢালের মতন রেখে পিপের আড়ালে আড়ালে চল ! পশুপক্ষীর মতন দূরে থেকে, শিকারীর গুলিতে প্রাণ দিতে আমরা রাজি নই ! ওরাও আমাদের কাছে আসুক—আমরা মানুষ, আমরা মরব বটে, কিন্তু মেরে মরব—চারিদিকে মরণকে দু-হাতে ছড়িয়ে দিয়ে মরব—ওদের জানিয়ে দিয়ে মরব যে, আমরা মানুষ !"

সমুদ্রের মহা-গর্জ্জনের সঙ্গে আবার অনেকগুলো বন্দুক গর্জ্জন ক'রে উঠল !

অমিয় আবার গাইলে—

"জীবন-মরণ একসাথে আজ
নৃত্য-লীলায় মত্ত থাকে,

জীবন চাহে মরণকে ঐ,
মরণ চাহে জীবনটাকে !
মরণ বলে—"জীবন রে ভাই,
বল তো আজ কোন্ সুরে গাই ?"
জীবন বলে—"মরণ, এস,
তোমার সুরেই বাজাই বাঁশী !"
বুকের ভিতর জীবন নিয়ে
মরতে মোরা ভালোবাসি !"

ফিরে দেখলুম, আমাদের জাহাজখানা একেবারে জলের তলায় ডুব মারলে—সমুদ্রের উপরে চক্রাকারে প্রকাণ্ড একটা বুদ্বুদ তুলে।

এবং ওদিক থেকে একখানা বোট তীরবেগে এগিয়ে আসছে, তার ভিতরে সব মানোয়ারি গোরা !

বীরেনদা বললে, "ঐ ওরা আসচে ! তোমরা প্রস্তুত হও—মারতে আর মরতে !"

আমি বললুম, "আমি প্রস্তুত !"

অমিয় কিছু বললে না, হাসতে হাসতে আবার গান ধরলে—

"জীবন নিয়ে জীবন দেব,
অমনি মোরা দেবনা গো !
জাগো মরণ, জীবন-হরণ !
মরণ-হরণ জীবন জাগো !
আজকে দেহের রক্ত মাঝে
ভীষণ-মধুর ছন্দ বাজে,

ক্ষুদ্র মনে রুদ্র নাচে—
মৃত্যু নিল' শঙ্কা গ্রাসি !
এই জীবনের বাসর-ঘরে
মর্‌তে মোরা ভালোবাসি !"

আবার একঝাঁক গুলি এসে আমাদের মাথার উপর দিয়ে চ'লে গেল। মরণ যেন আজ আমাদের জেগে-ওঠা জীবনকে দংশন করতে রাজি নয়,—যেন আমাদের জীবনের সঙ্গে সত্যসত্যই মরণ আজ সন্ধি স্থাপন করেছে !

তারপর আরও এক অভাবিত ব্যাপার ! গোরার দল বোট নিয়ে আমাদের পেরিয়ে চ'লে গেল—বোম্বেটেদের নৌকো যেদিকে গিয়েছে সেই দিকে ! মাত্র আমাদের এই তিনজনকে ধরতে এসে ওরা বোধ হয় নৌকা-বোঝাই বোম্বেটের দলকে পালাবার সুযোগ দিতে রাজি নয় !

বীরেনদা সহাস্যে বললে, "যাক্, এ-যাত্রাও মারবার আর মরবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া গেলে !"

আমি বললুম, "সেজন্যে খুসি হব কিনা বুঝতে পারচি না। এই তো দ্বীপ আমাদের সামনে। এখন এর ভিতরে আবার যে কি নাটকের অভিনয় সুরু হবে, কোন্‌খানে যে তার যবনিকা পড়বে, কিছুই তো আন্দাজ করতে পারচি না !"

খানিক পরেই দ্বীপে এসে উঠলুম—আবার পৃথিবীর মাটির উপরে পা দিলুম—মনে হ'ল, বিদেশ থেকে আবার যেন মায়ের কোলে এসে উঠলুম !

সমুদ্রতটের বালির বিছানার পরেই কী ভীষণ অরণ্য! লতায়-পাতায় জড়ানো বড় বড় নানাজাতির গাছ পাশাপাশি ঘ্যাঁসাঘেঁসি ক'রে দাঁড়িয়ে সাগরগর্জ্জনের সঙ্গে মর্ম্মর-গর্জ্জন মিশিয়ে দিচ্ছে! তাদের পায়ের তলাতেও এমন নিবিড় জঙ্গল যে, পথ খুঁজে পাওয়া তো দূরের কথা, দুহাত পরে কি আছে তাও দেখবার কি বোঝবার উপায় নেই! বন-জঙ্গল যে এমন দুর্গম হ'তে পারে আগে তা জানতুম না! এ অরণ্য যেন নিষ্ঠুর প্রহরীর মতন পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, বাইরের জনপ্রাণীকেও ভিতরে প্রবেশ করতে দেবে না!

অমিয় হতাশ ভাবে বললে, "এ যে আর এক বিপদ! এ-জঙ্গলের ভিতরে ঢুকলে কি আর বেরুতে পারব?"

বীরেনদা বললে, "ঢুকতে পারলে বেরুতেও পারব! কিন্তু কথা হচ্ছে, ঢুকি কেমন ক'রে? বোধ হয় আমাদের পথ কেটেই ঢুকতে হবে। সরল, পিপের মুখ খুলে তিনখানা কুড়ুল বার কর তো!"

কিন্তু বীরেনদার কথা আমি শুনেও শুনলুম না,—আমার চোখদুটো তখন জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে আছে—আমার গায়ের রোম-গুলো তখন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে!

জঙ্গলের ঘন লতা-পাতার আড়ালে লুকিয়ে দু-দুটো অদ্ভুত চক্ষু জ্বল্-জ্বলে দৃষ্টিতে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে। সে চক্ষু কোন পশুর চক্ষু নয়, কিন্তু মানুষের দৃষ্টিও তার মধ্যে নেই! একটা জ্বলন্ত হিংসার ভাব, একটা ভূতুড়ে ক্ষুধার আগ্রহ যেন তাদের ভিতর থেকে ফুটে-ফুটে উঠছে!

বীরেনদা বললে, "সরল, ও সরল! শুনতে পাচ্ছ? অমন ক'রে ওদিকে তাকিয়ে আছ কেন?"

আমি কাঠের পুতুলের মতন আঙুল তুলে জঙ্গলের সেইখানটা দেখিয়ে দিলুম।

বীরেনদাও সেইদিকে চোখ ফিরিয়ে চমকে উঠল!—অস্ফুট স্বরে বললে, "আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!"

অমিয়ও দেখলে—সবিস্ময়ে বললে, "কি ওটা! জন্তু, না ভূত?"

বীরেনদা তীরের মত সেইদিকপানে ছুটে গেল—নিজের বিপদের কথা একবারও ভেবে দেখলে না।

দশম পরিচ্ছেদ

মৃত্যু-গহ্বর ও অস্থিসার হাত

আমি পিছু ডাকলুম, "বীরেনদা, বীরেনদা! যেওনা—ওদিকে যেওনা!"

কিন্তু বীরেনদা থামলেও না—ফিরেও তাকালে না, অকুতোভয়ে সেই হিংস্র ও প্রদীপ্ত চক্ষু-দুটোর দিকে অগ্রসর হ'ল।

চোখদুটো আরো-জ্বলন্ত আরো-বিস্ফারিত হয়ে উঠল—ক্ষণিকের জন্যে। তারপর বিদ্যুতের মতন সাঁৎ ক'রে আড়ালে স'রে গেল।

বীরেনদাও থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল।......শুনতে পেলুম, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মড়্‌-মড়্‌ ক'রে শুক্‌নো পাতা মাড়িয়ে কে চ'লে যাচ্ছে—দ্রুতপদে, দূর হ'তে আরো দূরে!

অমিয় আবার বললে, "কি ওটা? জন্তু, না ভূত, না মানুষ?"

যে-ঝোঁপে চোখদুটো আবির্ভূত হয়েছিল তার উপরে বার-কয়েক লাথি মেরে বীরেনদা বললে, "কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু,—আরে এ কি? অমিয়! সরল! পথ পাওয়া গেছে—পথ পাওয়া গেছে!"

এগিয়ে গিয়ে দেখলুম, সেই ঝোঁপটার পাশ দিয়েই খুব সরু একটা পথ জঙ্গল ভেদ ক'রে ভিতর-দিকে চ'লে গিয়েছে।

বীরেনদা বল্‌লে, "এতক্ষণ লুকিয়ে লুকিয়ে যে আমাদের দেখছিল, এই পথ দিয়েই সে এসেছে, আর এই পথ দিয়েই সে পালিয়েছে।"

আমি বললুম, "হয়তো সে পালায় নি। খানিক তফাতে গিয়ে আমাদের অপেক্ষায় ঘাপ্‌টি মেরে ব'সে আছে।"

বীরেনদা বললে, "তার কথা পরে ভাবা যাবে তখন। আপাততঃ এই পথের মুখে দাঁড়িয়ে আমি পাহারা দিচ্ছি। ততক্ষণে তোমরা দুজনে মিলে এক কাজ কর। ঐ পিপে-তিনটের ভিতর থেকে কতকগুলো নেহাৎ-দরকারি জিনিষ বার ক'রে নিয়ে, ওগুলোকে বালির ভিতরে পুঁতে রেখে এস। শীগ্‌গির যাও—দেরি কোরো না।"

আমরা তাইই করলুম। আগে পিপেগুলোর মুখ খুলে আমাদের দরকার হ'তে পারে এমন কতকগুলো জিনিষ বার ক'রে নিয়ে পোঁটলা বাঁধলুম। তারপর সমুদ্র-তটের বালি সরিয়ে পিপে-তিনটেকে একে একে পুঁতে ফেললুম। পাছে জায়গাটা আবার খুঁজে না পাই, সেই ভয়ে সেখানটায় নিশানা রাখতেও ভুললুম না।

বীরেনদা বললে, "বোধ হয় তোমাদের কেউ দেখতে পায়নি। একটা বন্দুক আর একটা কুড়ুল আমাকে দাও। এখন এস, আমরা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকি। কিন্তু খুব সাবধানে পথে চলতে হ'বে—এ অজানা জঙ্গল, বিপদের সম্ভাবনা চারিদিকেই।"

আগে বীরেনদা, তারপর আমি, তারপর অমিয়—এই ভাবে আমরা অগ্রসর হলুম। ভারি সরু পথ—একসঙ্গে দুজনে পাশাপাশি এগুনো যায় না। বাঁদিকে ঘন জঙ্গল, ডানদিকে ঘন জঙ্গল, মাথার উপরে অগুন্তি গাছের পাতা-ভরা ডালপালার চাঁদোয়া আকাশ ঢেকে আছে আর পায়ের তলায় খালি শুক্‌নো পাতার মড়্‌মড়ানি। চারহাত সাম্‌নেও নজর চলেনা—চারহাত পিছনেও নজর চলেনা।

বন ক্রমে আরো নিবিড় হয়ে উঠল—এত নিবিড় যে সেই দিন-দুপুরেই মনে হ'তে লাগ্‌ল, আমরা যেন রাতের উথ্‌লে-ওঠা আঁধার-সায়রের ভিতর দিয়ে কোন্ অপারে দিগ্বিদিক হারিয়ে সাঁৎরে চলেছি।

বীরেনদা বললে, "ইলেকট্রিক্-টর্চ্চটা আমার হাতে দাও তো, আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!"

সেই অতি-নির্জ্জন ও অতি-নিস্তব্ধ অরণ্য বীরেনদার গলার আওয়াজ শুনে যেন শিউরে শিউরে উঠল,—এ বন যেন মানুষের গলা কখনো শোনেনি, মানুষের ছায়া কোনদিন গায়ে মাখেনি—নিজের নিসাড়তায় ও নিজের অন্ধকারে এ যেন নিজেই স্তম্ভিত হয়ে আছে।

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, "কিন্তু বীরেনদা, এমন গহন বনের ভিতরে এমন পথ বানালে কে? এ পথ তো আপনি তৈরি হয় নি!"

বীরেনদা কেবল বললে, "হ্যাঁ, এ পথ মানুষেরই হাতে তৈরি বটে।"

আবার সবাই চুপ! বীরেনদার হাতের বৈদ্যুতিক মশালের আলোটা থেকে থেকে পথহারা পাখীর মতন সেই অরণ্য-কারাগারের চারিদিকে ছুটোছুটি করছে, তাই দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চল্‌লুম।

মাঝে মাঝে বীরেনদা থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে, আর কাণ পেতে কি শোনে, তারপর আবার চলতে থাকে। আমাদের সকলেরই মনে হ'তে লাগল, আমাদের আগে আগে পথের শুক্‌নো পাতার উপরে আর কার পায়ের শব্দ হচ্ছে! ও কে যাচ্ছে আমাদের আগে আগে?—সেই যার

জ্বলন্ত চোখ ?……নানা দিকে বার বার বিজলী-মশালের আলো ফেলেও কারুকে আবিষ্কার করা গেল না। কিন্তু সেই অজানা পায়ের শব্দ আমাদের আগে আগে সমানই এগিয়ে চলল—আমরা তাড়াতাড়ি এগুতে গেলেই সে-শব্দও তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় !

বন যে অন্ধকার, এখন সেটা সৌভাগ্যের কথাই ব'লে মনে হ'তে লাগল। কারণ এর গর্ভের ভিতরে হয়তো এমন আরো অনেক বিভীষিকা লুকানো আছে, যা দেখলে আমাদের আবার মানে মানে সমুদ্রের ধারে ফিরে যেতে হ'ত। একবার এক জায়গায় বিজলী-মশালের আলো পড়তেই দেখতে পেলুম, প্রকাণ্ড একটা অজগর সাপ দুই চক্ষে অগ্নিবৃষ্টি ক'রে আস্তে আস্তে গাছপালার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে ' আর এক জায়গায় বাঘের মতন কি-একটা জানোয়ার জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরেই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল ! প্রতি পদেই মনে হ'তে লাগল, এই নিরেট অন্ধকারের রাজ্যে, চারিদিকে অদৃশ্য সব বিপদ লোলুপ চোখে আমাদের পানে তাকিয়ে আছে, একবার কেউ একটু অন্যমনস্ক হ'লেই তারা সবাই মিলে হুড়্মুড়্ ক'রে আমাদের ঘাড়ের উপরে লাফিয়ে পড়বে !

হঠাৎ আমাদের সাম্‌নে অন্ধকারের ভিতরে কি-রকম একটা শব্দ হ'ল—কার হাত থেকে কি যেন প'ড়ে গেল ! দু-পা এগুতেই পায়ে কি ঠেক্‌ল, তুলে দেখি, বিজলী-মশাল—যা বীরেনদার হাতে ছিল !

কল টিপে আলো জেলে যা দেখলুম, প্রাণ যেন উড়ে গেল ! ঠিক দু-পা পরেই মাঠের মতন প্রকাণ্ড একটা গহ্বর হাঁ ক'রে আছে ! আর আমার সাম্‌নে বীরেনদা নেই !

খুব নীচে থেকে—যেন পাতালের বুক ভেদ ক'রে বীরেনদার গলার আওয়াজ পেলুম—"সরল! অমিয়! দড়ী ঝুলিয়ে দাও—দড়ী ঝুলিয়ে দাও—শীগ্‌গির!"

সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে একটা কাণ-ফাটানো প্রাণ-দমানো অট্টহাসি জেগে উঠল—হাহাঃ, হাহাঃ, হা হা হা হা——

সে হাসি মানুষের, না প্রেতের?

কিন্তু আমাদের তখন এমন অবসরও ছিল না যে, সে হাসি শুনে ভয় পাই! তাড়াতাড়ি আমি পথের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লুম, তারপর গহ্বরের ভিতরে মুখ বাড়িয়ে আলো ফেলে দেখলুম—প্রায় পনেরো-বিশ হাত নীচে কালো জল থৈ-থৈ করছে! জলের চারিধারেই পাথুরে পাড় খাড়া ভাবে উপরে উঠেছে। কাজেই এর ভিতরে একবার পড়লে সাঁতার জানলেও বাঁচোয়া নেই। এই পনেরো-বিশ হাত দেওয়াল বয়ে মানুষের পক্ষে উপরে ওঠা অসম্ভব।

এদিকে-ওদিকে বার-কয়েক বিজলী-মশালের আলো ফেলে বীরেনদাকে আবিষ্কার করলুম। সে পাড়ের ঠিক তলাতেই সাঁতার দিতে দিতে উপরে ওঠবার জন্যে নিষ্ফল চেষ্টা করছিল।

বীরেনদা আবার চেঁচিয়ে বললে, "শীগ্‌গির দড়ী ফেলে দাও—জলের ভেতরে কুমীর আছে!"

কুমীর! বিজলী-মশালটা তাড়াতাড়ি অমিয়ের হাতে দিয়ে, থলে থেকে দড়ী বার ক'রে জলের ভিতরে ফেলে দিলুম। বীরেনদা সেই মুহূর্ত্তেই হাত বাড়িয়ে দড়ীটা ধরলে এবং পর-মুহূর্ত্তেই একটা প্রকাণ্ড কুৎসিত মাথা বীরেনদার পিছনে জলের উপরে জেগে উঠল।

অমিয় চীৎকার ক'রে বললে, "বীরেনদা! তোমার পিছনে কুমীর!"

কিন্তু অমিয়ের কথা শেষ হবার আগেই জোরালো হাতের এক ঝাঁকানি দিয়ে বীরেনদা দড়ী ধ'রে জল ছেড়ে খানিকটা উপরে উঠে পড়ল। কুমীরটা ফলার মুখছাড়া হয় দেখে তার লম্বা-চওড়া ল্যাজ দিয়ে বীরেনদাকে লক্ষ্য ক'রে প্রচণ্ড এক ঝাপ্‌টা মারলে। সে ভীষণ ল্যাজ যদি বীরেনদার গায়ে লাগত, তাহ'লে তার হাড়গোড় নিশ্চয়ই গুঁড়ো হয়ে যেত—কিন্তু বীরেনদা আবার এমন এক ঝাঁকানি দিয়ে কুমীরের নাগালের বাইরে চ'লে এল যে, সেই বিষম টানের চোটে আমিও আর একটু হ'লেই জলের ভিতরে হুম্‌ড়ি খেয়ে প'ড়ে যাচ্ছিলুম।

ওদিকে সেই ভয়ানক অট্টহাস্যের বিরাম নেই! সে হাসির উচ্ছ্বাসের পর উচ্ছ্বাসে চারিদিককার রন্ধ্রহীন অন্ধকার যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে ঝ'রে ঝ'রে পড়তে লাগল!—অমিয় নানাদিকে বারবার আলো ফেলেও বার করতে পারলে না যে, কোথা থেকে কে অমন ক'রে ঐ ভুতুড়ে হাসি হাসছে!······তারপর, বীরেনদা যখন নিরাপদে দড়ী বয়ে আবার ডাঙার উপরে এসে উঠল, সেই হাসি তখন হঠাৎ থেমে গেল। চারিদিক আবার স্তব্ধ!

উপরে উঠেই বীরেনদার সব-প্রথম কথা হ'ল—"টর্চ্চটা তো পেয়েচ দেখচি। কিন্তু পড়বার সময়ে আমি আমার বন্দুকটাও হারিয়েচি। দেখ তো, বন্দুকটা ওপরেই আছে, না জলে প'ড়ে গেছে?"

সৌভাগ্যক্রমে বন্দুকটাও উপরেই খুঁজে পাওয়া গেল। বীরেনদা খুসি হয়ে বললে, "যে-জায়গায় এসেচি, এখানে বন্দুকই হচ্ছে আমাদের প্রাণের মত। বন্দুক হারালে প্রাণও হয়তো হারাতে হবে।······অমিয়,

মশালটা আমার হাতে দাও। এখন আবার পথ খুঁজে বার করতে হবে।”

পথ সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল। গহ্বরের সামনে এসেই পথটা বাঁ-দিকে বেঁকে পাড়ের উপর দিয়ে চ'লে গেছে। অন্ধকারে তা দেখতে না পেয়েই বীরেনদা গহ্বরের ভিতরে প'ড়ে গিয়েছিল।

আমরা আবার অগ্রসর হলুম—এবারে আরো সাবধানে। কারণ, একে তো এই সরু পথ,—তার উপরে বাঁদিকে ঘন জঙ্গল আর ডানদিকে সেই মৃত্যু-গহ্বর, একবার পা পিছ্‌লোলে কি হোঁচট খেলে আর রক্ষা নেই।

প্রায় মাইল-খানেক হাঁটবার পর গহ্বর শেষ হ'ল, কিন্তু তখনো সেই ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার আর আঁকাবাঁকা পথের শেষ পেলুম না। দুইধারে ঘন-বিন্যস্ত অরণ্য নিয়ে পথ আবার কোন্ অজানার দিকে চ'লে গেছে!

আরো ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ সেই বিষম পথ শেষ হ'ল—আমরা আবার খোলা আকাশের তলায় এসে দাঁড়ালুম—উজ্জ্বল আলোকের আঘাতে আমাদের অন্ধকার-মাখানো চোখগুলো যেন কাণা হয়ে গেল!

চোখ যখন পরিষ্কার হ'ল, দেখলুম সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

মস্ত এক মাঠ—তার বুকে ছোট ছোট চারাগাছ আর ঘাসের মধুর শ্যামলিমা আর রকম-বেরকম বনফুলের রামধনু-রঙের লীলা! মাঠের পরেই একাণ্ড এক পাহাড় আকাশকে ধরবার জন্যে যেন উপরে—আরো উপরে উঠে গেছে। তার কোলে লাখো-লাখো গাছ সমুদ্র-স্নান থেকে ফিরে-আসা হাওয়ার ঠাণ্ডা ছোঁয়া পেয়ে পরমোল্লাসে দুলে দুলে নেচে উঠছে! পাহাড়ের মাঝখান থেকে একটি ঝরণা গলানো রূপোর

বিজয়া

ধারার মতন পাথরে পাথরে লাফাতে লাফাতে কৌতুক-হাসি হাস্‌তে হাসতে নীচে নেমে এসে, মাঠের সবুজ বুক আদরে ভিজিয়ে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, আর সেই রূপের হাটে নানা-জাতের পাখীরা গানের আসর বসিয়ে প্রাণ মাৎ ক'রে দিচ্ছে!

অমিয় আহ্লাদে মেতে গান সুরু করলে—

স্বরগের বুক থেকে আলো-মেয়ে দুলে দুলে,
নেমে আসে বনে বনে, নেমে আসে ফুলে ফুলে।
কাননের বুক থেকে, আদরের ডাক ডেকে
নাচে পাখী, গানে তার মরমের দ্বার খুলে!
নীলিমার বুক থেকে, সুষমার মুখ দেখে,
ছুটে চলে সমীরণ তটিনীর কূলে কূলে!
কুসুমের বুক থেকে, লাল-নীল রঙ্‌ মেখে,
ওড়ে কত প্রজাপতি ছোট পাখা খুলে খুলে।
ধরণীর বুক থেকে, আয় তোরা যাবি কে কে,—
স্বপনের তপোবনে তপনের তাপ ভুলে!

বীরেনদা একদিকে আঙুল তুলে ব'লে উঠল, "থামো অমিয়, ওদিকে একবার চেয়ে দেখ!"

ফিরে দেখি, সেই চোখদুটো! সেই ক্ষুধা-ভরা হিংসামাখা অগ্নি-উজ্জ্বল চোখদুটো আবার একটা জঙ্গলে ঝোপের ফাঁক দিয়ে আমাদের পানে তাকিয়ে পলক-হারা হয়ে আছে! আর কিছু দেখা যাচ্ছে না,

কেবল সেই চোখদুটো! তার চাউনি দেখলে খুব সাহসীরও বুকের কাছটা হিম হয়ে যায়!

অমিয় রবিবাবুর গান ধরলে—

"ঐ আঁখি রে,
ফিরে ফিরে চেওনা চেওনা, ফিরে যাও,
কি আর রেখেচ বাকি রে!"

বীরেনদা আর আমি দুজনেই একসঙ্গে বন্দুক তুললুম।

কিন্তু চোখদুটো আবার সাঁৎ ক'রে স'রে গেল—জঙ্গলের পথে আবার শুক্‌নো পাতার মড়্‌মড়ানি উঠল, বুঝলুম যার চোখ সে দৌড়ে পালাচ্ছে!

বীরেনদা উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "কার ঐ চোখ? ও কেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরচে? ও চোখে তো মানুষের চাউনি নেই! তবে কি সত্যি সত্যি ভূত-প্রেত ব'লে—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "ও-কথা যেতে দাও বীরেনদা! এখন আমরা কি করব বল।"

বীরেনদা বললে, "আমরা? আমরা আপাততঃ ঐ পাহাড়ের উপরে গিয়ে উঠব। ঐখানে ঝরণার ধারে ব'সে আজকের রাতটা তো কাটিয়ে দি, কালকের কথা কালকে ভাবা যাবে অখন।"

* * *

পাহাড়ের উপরে এসে যে জায়গাটি আমাদের পছন্দ হ'ল, তার একধারে ঝরণা, একধারে গভীর খাদ আর একধারে পাহাড়ের গা খাড়া উপরে উঠে গিয়েছে। পাহাড়ের গায়েই—গুহা নয়, অথচ গুহার

মতনই একটা জায়গা ছিল, আমরা স্থির করলুম, তার ভিতরে ব'সেই আজকের রাতটা কাটিয়ে দেব।

সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার আগে জাহাজের ভাঁড়ার-ঘর থেকে আমরা অনেকগুলো বিস্কুট, জাম-জেলি ও রক্ষিত মাছ-মাংসের টিন সংগ্রহ ক'রে এনেছিলুম। ঝরণার ধারে ব'সে মুখ-হাত ধুয়ে সেই টিনের খাবারেই পেট ভরালুম—খাবারগুলো লাগল যেন অমৃতের মত! আর ঝরণার জল? সে যে কী মিষ্টি, তা আর কি বলব!

তারপর সেই আধা-গুহার ভিতরে গিয়ে বসলুম। তখন বেলা যায়-যায়। সন্ধ্যা তার ছায়া-আঁচল দুলিয়ে তখন ডুবে-যাওয়া সূর্য্যের শেষ-আলোটুকু নিবিয়ে দিয়েছে। দু-একটা বাসা-ভোলা পাখী মাঝে মাঝে তখনো এদিকে-ওদিকে উড়ছে ও আসন্ন আঁধারকে দেখে ভীত-চকিত স্বরে ডেকে ডেকে উঠছে।

স্থির হ'ল, প্রথম রাতে বীরেনদাকে, মাঝ-রাতে আমাকে আর শেষ-রাতে অমিয়কে জেগে পাহারা দিতে হবে। কারণ তিনজনে একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লে এই বিপদ-ভরা বন-জঙ্গলে কাল সকালে হয়তো কারুকেই আর জেগে উঠতে হবে না।

আমি আর অমিয় শুয়ে পড়লুম। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি আর দুশ্চিন্তায় দেহ, মন যেন এলিয়ে পড়েছিল, শুতে না শুতেই ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে গেলুম।

…মাঝ-রাতে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বীরেনদা শুয়ে প'ড়ে চোখ মুদলে।

এককোণ ঘেঁসে পাহাড়ের গায়ে ঠেসান্ দিয়ে বস্‌লুম।

বিজয়া

রাত তখন থম্‌থম্‌ করছে—বাইরে অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় চক্‌মকিয়ে উঠে ঝরণা তার অশ্রান্ত সঙ্গীতকে যেন নিশীথিনীর নিসাড় বুকের ভিতরে দুলিয়ে দুলিয়ে দিচ্ছে!

রাতের একটি বাঁধা সুর আছে! সে সুর গাছের পাতার নয়, ঝিঁঝিপোকার নয়, বাতাসের নয় বা আর কোন জীবের নয়—সে হচ্ছে রাতের নিজস্ব সুর! বিজন স্তব্ধতার ভিতরে তা শোনা যায়, বোবা আকাশকে স্তম্ভিত ক'রে, সারা ধরণীকে আকুল ক'রে সে বিচিত্র সুর ঝিম্‌-ঝিম্‌ ক'রে বাজতে থাকে আর বাজতে থাকে, সে অদ্ভুত সুর শুনলে ভাবুকের মনের ভিতরটা যেন কেমন-কেমন ক'রে ওঠে—রাতের বীণায় সে যেন ভগবানের নিজের হাতে গাঁথা রাগিণী, যার অস্ফুট ঝঙ্কারের ভিতরে পৃথিবীর জন্ম-মৃত্যুর রহস্য লুকানো আছে!

রাতের সেই একটানা সুর কাণ পেতে শুনতে শুনতে হঠাৎ মনে হ'ল বাইরের আবছায়ার ভিতর থেকে আবার দুটো জ্বল্‌-জ্বলে তীব্র চোখ চম্‌কে উঠল! সেই দুটো চোখ—যা আজ সারা দিন আমাদের পিছু ছাড়েনি! ভালো ক'রে চেয়ে কিন্তু আর কিছু দেখতে পেলুম না। ভাবলুম, আমারি মনের ভুল।

আচম্বিতে কি-একটা জীবের কাতর আর্ত্তনাদে ও বাঘের ভীষণ গর্জ্জনে চারিদিক কাঁপতে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে ঘুম-ভাঙা পাখীদের ব্যস্ত চীৎকার! খানিক পরেই সব আবার চুপচাপ!

তারপরেই দেখি, একখানা কালো-কুৎসিত অস্থি-সার হাত পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে, ধীরে ধীরে গুহার ভিতরে ঢুক্‌ছে। দেহ নয়, সুধু

একখানা হাত! তার বাঁকা বাঁকা লম্বা আঙুলগুলো আকুল হয়ে যেন কাকে খুঁজছে!

ধড়মড়িয়ে সোজা হয়ে উঠে বসলুম—একি, এ কী ব্যাপার?

আড়ষ্ট চোখে দেখলুম, হাতখানা বীরেনদার ঘুমন্ত দেহের উপরে এক-মুহূর্ত্ত স্থির হয়ে রইল, তারপর হঠাৎ খপ্ ক'রে তার গলা চেপে ধরলে!
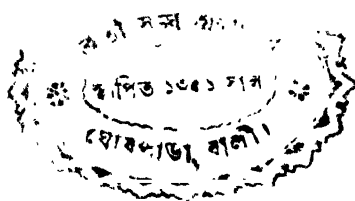
একাদশ পরিচ্ছেদ

অজানা দ্বীপের রাণী

বীরেনদার বিপদ দেখে এক পলকেই আমার সমস্ত অসাড়তা ছুটে গেল—বিদ্যুতের মতন সাম্‌নের দিকে হুম্‌ড়ি খেয়ে প'ড়ে, বন্দুকের নলটা সেই অস্থিসার হাতখানার উপরে রেখে ঘোড়া টিপলুম।

গুড়ুম ক'রে বন্দুক গর্জ্জন ক'রে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ এক আর্ত্তনাদ,—হাতখানাও সোঁ ক'রে স'রে গেল!

বীরেনদা ধড়্‌মড়্ ক'রে উঠে ব'সে গলায় হাত বুলোতে বুলোতে যাতনাভরে বললে, "সরল, সরল!"

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, "বীরেনদা, বীরেনদা! তোমার কি বড় বেশী লেগেচে?"

অমিয়ও উঠে ব'সে চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বললে, "হয়েচে কি বীরেনদা? হয়েচে কি সরলদা?"

আমি ব্যাপারটা সব খুলে বললুম!

বীরেনদা তখনি বিজলী-মশাল আর বন্দুকটা তুলে নিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু গুহার মুখে খানিকটা রক্ত ছাড়া বাইরে আর কারুকে দেখতে পাওয়া গেল না।

অমিয় আবার রবিবাবুর গান ধরলে ঃ-

"সে যে, পাশে এসে ব'সেছিল,
তবু জাগি-নি,
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল,
হতভাগিনী !"

আমি বললুম, "কিন্তু এই ভুতুড়ে শত্রুটা তো ভারি ভাবিয়ে তুললে দেখচি ! এ ধরাও পড়ে না, আমাদের ছেড়েও যায় না !"

বীরেনদা বললে, "কিন্তু বাছাধন আপাততঃ বোধ হয় আর শীগ্‌গির এমুখো হচ্ছেন না ! সরলের গুলি খেয়ে এখন হাত নিয়ে কিছুদিন কাৎ হয়ে থাকুন তো !"

এম্‌নি সব কথা কইতে কইতে আকাশ ধীরে ধীরে ফর্সা হয়ে এল।

বনের পাখীরা অগ্রদূত হয়ে খবর দিলে—আর ভয় নেই, এখনি আনন্দের সাথী প্রভাত আসবে।

ভোর হ'ল ! বনের সবুজের উপরে কচি রোদ এসে কাঁচা সোনার-জলের ছবি এঁকে দিলে। মৌমাছি আর প্রজাপতিদের ভিতরে আবার মৌ-চয়নের সাড়া প'ড়ে গেল।

বীরেনদা বললে, "এস, আমরা এখন পাহাড় থেকে নেমে পড়ি। পোঁট্‌লা-পুঁটুলি বেঁধে নাও।"

অমিয় বললে, "কিন্তু বীরেনদা, এখন যে আমাদের শালগ্রামের ওঠা-বসা। এখানে থাকাও যা, নীচে নামাও তা !"

বীরেনদা বললে, "না না, তুমি বুঝচ না অমিয় ! একবার চারি-

দিকটা ঘুরে দেখে আসা ভালো ! নইলে কোন্‌দিক দিয়ে কখন্‌ যে বিপদ ঘাড়ে এসে পড়তে পারে, তা জানবার আগেই মারা পড়ব।"...

ঝরণার জলে প্রাতঃস্নান সেরে, কিছু জলখাবার খেয়ে আবার আমরা পাহাড় ছেড়ে নীচে নেমে গেলুম।

মাঠ পেরিয়ে আবার একটা বনে গিয়ে পড়লুম। এবারের বনেও জঙ্গল আর বড় বড় গাছের অভাব নেই বটে, কিন্তু আগেকার মতন এ বনটা তেমন অন্ধকার নয়।

আমি বললুম, "তোমরা একটু সাবধান হয়ে চল। কারণ কাল রাতে আমি বাঘের ডাক শুনেচি।"

অমিয় বললে, "বাঘ-টাঘের সঙ্গে এখন দেখা করতে চাই না বটে, কিন্তু একটা হরিণ-টরিণ পেলে আজকের দিনটা নেহাৎ মন্দ কাটে না— কি বল বীরেনদা ?"

বীরেনদা বললে, "পৃথিবীর চারিদিকেই হিংসার খেলা ! বাঘ খুঁজচে আমাদের, আমরা খুঁজচি হরিণকে। আমরা ভাবি বাঘকে হিংসুক আর আমাদের হিংসুক ভাবে হরিণরা। অদ্ভুত এই দুনিয়া !"

আমি কি-একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তার আগেই মাথার উপরকার মস্ত-বড় গাছ থেকে ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ ক'রে কারা লাফিয়ে পড়ল এবং কিছু দেখবার বা বোঝবার আগে এমন অতর্কিতে তারা আমাদের আক্রমণ [illegible] ক'রে হাত-পা বেঁধে ফেললে যে, আমরা একেবারে অবাক হয়ে গেলুম !

তারা দেখতে খুব জোয়ান, যেন মিশ্‌মিশে কালো আবলুস্‌ কাঠ থেকে কুঁদে তাদের দেহগুলো গড়া হয়েছে। কারুর হাতে ধনুক-বাণ,

কারুর হাতে বর্ষা। গলায়, কাণে, বাহুতে হাড়ের গহনা আর পরোণে এক এক টুক্‌রো নেংটি ছাড়া আর কিছুই নেই। দলে তারা বেশ পুরু—অন্ততঃ পঁচিশ-ত্রিশ জন।

আমাদের হাত-পা আচ্ছা ক'রে বেঁধে তিনজনকেই তারা মাটির উপরে শুইয়ে রাখলে। তারপর আমাদের চারিদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে অজানা ভাষায় হাত-মুখ নেড়ে তারা কি বলাবলি করতে লাগল।

অমিয় বললে, "ও বীরেনদা! এখন বোধ হয় আমাদের আর হরিণের মাংস খাবার কোনই আশা নেই। এই কেলে স্যাঙাতরাই আমাদের হয়তো আগুনে পুড়িয়ে কাবাব বানিয়ে উদরসাৎ করবে!"

বীরেনদা বললে, "চোখে বড় ধূলো দিয়েচে হে! বোম্বেটে, মানোয়ারি গোরা, হাঙর, কুমীর আর সমুদ্রকে এড়িয়ে শেষটা যে এই বুনোদের পাল্লায় এমন বোকার মত ধরা প'ড়ে যাব আগে কে তা জান্‌ত বল?"

আমি বললুম, "ধরা-পড়া ব'লে ধরা-পড়া! একেবারে নট্ নড়ন-চড়ন, নট কিচ্ছু! ছাড়ান্ পাবার কোনই উপায় নেই, দয়াও পাবনা বোধ হয়। ওদের গলায় কি ঝুল্‌চে দেখ্‌চ তো? মড়ার মাথার খুলি!"

আচম্বিতে কাছেই শিঙার মতন কি-একটা বেজে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে অনেক ঢোলের আওয়াজ জেগে উঠল এবং অসভ্য মানুষগুলো সসম্ভ্রমে নুয়ে প'ড়ে আমাদের কাছ থেকে খানিকটা তফাতে স'রে দাঁড়াল।

দেখলুম, বনের চারিদিক থেকে পিল্‌পিল্ ক'রে অসভ্যের পর অসভ্য

যোদ্ধা বেরিয়ে আসছে নাচতে নাচতে, বর্ষা নাচাতে নাচাতে বা ঢোল বাজাতে বাজাতে!

অমিয় বললে, "ও বীরেনদা—আরো আসে যে! কি করা যায় বল দেখি? কেলে ভূতগুলো দূরে স'রে গেছে, বন্দুকগুলোও হাতের কাছে প'ড়ে রয়েচে, আর আমার মনও বলচে, এই বাঁধনদড়ীগুলা অল্প চেষ্টা করলেই আমরা ছিঁড়ে ফেলতে পারি!"

বীরেনদা বললে, "দড়ী ছেঁড়বার সময় এখনো আসে নি। ওদের হাতেও তীর-ধনুক রয়েচে, বলা তো যায় না—যদি ওদের তীরে বিষ মাখানো থাকে? তার চেয়ে এখন চুপ ক'রে থাকাই ভালো, দেখনা কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়?"

দেখতে দেখতে বনের আশপাশ লোকে লোকে ভ'রে গেল—সকলেরই কৌতূহলী চোখ আমাদের দিকে আকৃষ্ট!

হঠাৎ আবার শিঙা বাজল—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নাচ-বাজনা থেমে গেল। সকলে একেবারে পাথরের মূর্ত্তির মতন স্থির ও স্তব্ধ!

একদিককার ভিড় স'রে গেল। সেইদিকে তাকিয়ে যা দেখলুম সে এক অকল্পিত দৃশ্য!

অপূর্ব্ব এক তরুণীর মূর্ত্তি—রং তার ফুটন্ত শ্বেতপদ্মের মত!

তরুণীর মেঘের মতন কালো চুল পিছনে, কাঁধে, বুকে গোছায় গোছায় এলিয়ে পড়েছে এবং তার বুক থেকে উরু পর্য্যন্ত বাঘের ছালে ঢাকা!

সমস্ত মন বিস্ময়ে ভ'রে উঠল—কে এই নবযৌবনী, মানবী না বনদেবী?

স্বপ্ন-সুষমার মতন আমাদের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে তরুণী থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর দয়াভরা দুটি সুন্দর ডাগর চোখে আমাদের মুখের পানে চেয়ে রইল, নীরবে।

বীরেনদা মোহিত স্বরে বললে, "সরল, আমি তো কিছুই বুঝতে পারচি না, এ মূর্ত্তি এখানে কি ক'রে এল ?"

আমাদের সকলকে অধিকতর বিস্মিত ক'রে তরুণী খুব নরম মিষ্টি গলায়, পরিষ্কার বাংলায় বললে, "আপনারা কি বাঙালী ?"

প্রথমটা নিজেদের কাণকে বিশ্বাস করতে না পেরে আমরা অবাক হয়ে রইলুম। তারপর আবার সেই জিজ্ঞাসা শুনে আমি বললুম, "হ্যাঁ।"

তরুণী অভিভূত কণ্ঠে বললে, "কত দিন পরে দেশের কথা শুনলুম ! কত দিন পরে বাঙালীকে দেখলুম !"

বীরেনদা বললে, "আপনার কথা শুনে আপনাকেও তো বাঙালী ব'লেই মনে হচ্ছে।"

—"হ্যাঁ, আমি বাঙালীর মেয়ে।"

—"বাঙালীর মেয়ে ! এইখানে—এই অজানা দ্বীপে—এই অসভ্যদের মাঝখানে !"

তরুণী করুণ স্বরে বললে, "সে অনেক কথা, পরে বলব।···আপাততঃ শুনে রাখুন, আমি এই দ্বীপের রাণী, আর আপনারা আমার বন্দী। আপনাদের সঙ্গে এখন আমি আর কথা কইতে পারব না, তাতে আপনাদের অমঙ্গল হবে। তবে এইটুকু বলতে পারি, আমি থাকতে আপনাদের কোন ভয় নেই।"

—এই ব'লেই তরুণী ফিরে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে আমাদের অবোধ্য ভাষায় সঙ্গের লোকদের ডেকে কি বললে।

অম্‌নি আবার শিঙা বেজে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে আবার ঢোল বাজানো, নাচ ও হৈ-চৈ সুরু হ'ল। তারপর কয়েকজন লোক এসে আমাদের পায়ের বাঁধন খুলে দিলে! এবং উঠে তাদের সঙ্গে যাবার জন্যে ইঙ্গিত করলে।

তরুণী রাণীকে নিয়ে অসভ্য লোকগুলো নাচতে নাচতে এগিয়ে চলল —চারিদিকে কড়া পাহারা নিয়ে আমরাও অগ্রসর হলুম।

অমিয় বললে, "সরলদা, হাত বাঁধা, কাজেই হাততালি দিতে পারব না, কিন্তু গলা যখন খোলা আছে তখন গান গাইব না কেন?" ব'লেই সুরু করলে :—

ওগো অজানা দেশের রাণী!
তোমার মুখেতে শুনি আমাদের
আপন প্রাণের বাণী!

* * *

কোন্ অমরার তুমি সে জোছনা,
বল বীণা-স্বরে কমললোচনা!
পূজিব তোমাকে মধুরবচনা,
জীবন ভরিয়া জানি—
শোনো, অজানা, অচেনা রাণী!

বিজয়া

ফোটে রাঙা ফুল চুমিয়া চরণে,
দেখে গায় মন নতুন ধরণে,
হব তব দাস জীবনে-মরণে,
রহিব অবাক মানি—
তুমি তরুণী অরুণী রাণী !
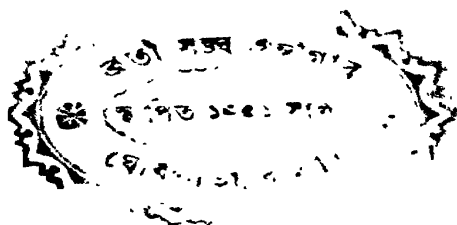
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বীরেনদার দার্শনিকতা

কখনো ছায়া-দোলানো বনপথ দিয়ে, কখনো রোদ-মাখানো সবুজ মাঠের উপর দিয়ে, এবং কখনো বা চোখ-ভোলানো ছোট ছোট পাহাড়ের কোল দিয়ে প্রায় মাইল-চারেক পায় হয়ে আমরা একটি বড় গ্রামে এসে হাজির হলুম।

গ্রাম বলতে আমরা যা বুঝি, এ গ্রাম যেন তার মূর্ত্তিমান প্রতিবাদ! কতকগুলো পাতা-ছাওয়া হেলে-পড়া ভাঙা-চোরা কুঁড়েঘর—এক-একটা গর্ত্তের মত ঢোকবার পথ ছাড়া সে ঘরগুলোতে আলো-হাওয়া আসবার কোন উপায়ই নেই! পাথ-ঘাটকে আস্তাকুড় বললেও বেশী বলা হয় না।

এক-একটা ঘরের সামনে আবার অনেকগুলো ক'রে রোদে-শুকনো মানুষের মাথা ঝুলছে! পরে শুনেছিলুম, এগুলো নাকি বড় বড় সর্দ্দারের বাড়ী! ছলে-বলে-কৌশলে যে যত বেশী শত্রুকে স্বহস্তে বধ ক'রে তাদের মাথা সংগ্রহ করেতে পারে, এ দেশে নাকি সেইই তত-বড় সর্দ্দার ব'লে মান্য পায় এবং আপনার বড়ত্বের প্রমাণস্বরূপ মাথাগুলোকে রোদে শুকিয়ে বাড়ীর সামনে এই ভাবে প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখে! এই কথা শোনবার পর যতদিন এদেশে ছিলুম, কাঁধের উপরে নিজেদের মাথা-গুলোকে ঠিকভাবে বজায় রাখবার জন্যে সর্ব্বদাই অত্যন্ত সাবধানে থাকতুম!

এরি-মধ্যে একখানা বাড়ী দেখলুম - যার দিকে সহজেই সকলের নজর পড়ে। এ বাড়ীখানাও পাতা-দিয়ে-ছাওয়া হ'লেও আর-সব ঘর বা বাড়ীর চেয়ে বড় তো বটেই, তার উপরে ঝক্‌ঝকে-তক্‌তকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাড়ীর সুমুখে দুজন লম্বাচওড়া লোক বর্ষা হাতে ক'রে পাহারা দিচ্ছে। এইটিই রাণীর বাড়ী ব'লে অ্যান্দাজ করলুম এবং একটু পরেই দেখলুম আমাদের আন্দাজ ভুল নয়।

আমাদের দেখবার জন্যে গাঁয়ের মেয়েরা পর্য্যন্ত আজ রাস্তায় এসে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। পুরুষদের মতন এখানকার স্ত্রীলোকদেরও লজ্জা রক্ষা পেয়েছে কেবলমাত্র এক এক খণ্ড সরু লেংটির দ্বারা। তবে মানুষের হাতের বদলে তারা পাথরের বা প্রবালের গহনা ব্যবহার ক'রে নিজেদের জাতিসুলভ কোমলতার মর্য্যাদা রেখেছে দেখে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলুম।

রাণীর বাড়ীর সামনে এসে দেখি, রাণী সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।

রাণী আমাদের দিকে ফিরেও তাকালেন না, কেবল প্রভুত্বের স্বরে কি-একটা হুকুম দিয়েই বাড়ীর ভিতরে চ'লে গেলেন।

রাজবাড়ীর কাছেই একখানা কুঁড়েঘরের দিকে তারা আমাদের নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালে। তারপর আমাদের হাতেরও বাঁধন খুলে দিয়ে ইঙ্গিতে জানালে, আমরা যেন ঐ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করি! আমরাও আর কালবিলম্ব না ক'রেই ঘরের ভিভরে গিয়ে ঢুকলুম। একটা লোক এসে আমাদের পোঁটলা-পুঁটলি আর বন্দুক-তিনটে ঘরের মেঝের উপরে

রেখে দিয়ে চ'লে গেল। উঁকি মেরে দেখলুম, দরজা বা গর্ত্তের বাইরেই প্রায় বিশ-বাইশ জন লোক পাহারা দিচ্ছে।

আমি বললুম, "বীরেনদা, এরা বোধ হয় জানেনা যে বন্দুক কি চীজ্! তা জান্লে কি আর এগুলো আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে যেত?"

বীরেনদা অন্যমনস্কের মত স্বধু বললে, "হুঁ।"

অমিয় বললে, "আচ্ছা বীরেনদা, আজ হঠাৎ তুমি এত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন বল দেখি? এমন 'অ্যাডভেঞ্চারে' কোথায় তুমি খুসি হয়ে নাচবে, না, কেবল "হুঁ, হাঁ,' দিয়েই কথা সারচ! তোমার হ'ল কি বীরেনদা? কী ভাবচ তুমি?"

বীরেনদা একটু কেঠো হাসি হেসে বললে, "আকাশ আর পাতালের কথা ভাবচি ভাই!"

—"আকাশ আর পাতাল চিরদিনই আছে আর চিরদিন থাকবেও! তা নিয়ে আবার চিন্তা-জ্বরে আক্রান্ত হওয়া কেন?"

—"ঈশ্বরও চিরদিন আছেন আর চিরদিন থাকেন। তবু কি মানুষ দিন-রাত তাঁরই কথা ভাবতে চেষ্টা করে না?"

আমি বললুম, "বীরেনদা, তুমি যে আবার হঠাৎ দার্শনিক হয়ে পড়লে দেখচি। ব্যাপার কি?"

—"দার্শনিক হওয়াটা কি নিন্দের কথা?"

—"উঁহু, মোটেই না। কিন্তু আমরা জানতে চাই বীরেনদা, তুমি কি আজ রূপসী রাণীকে দর্শন ক'রেই দার্শনিক হয়ে উঠেচ?"

বীরেনদা রেগে কট্মট্ ক'রে আমার দিকে চাইলে, কিন্তু মুখে কিছু বললে না।

অমিয় ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে গুণ্‌গুণ্ ক'রে গাইলে ঃ—

"কে জানে কি চোখে দেখেচি তোমায়,
প্রাণ আজ খালি ওই নাম গায়,
যৌবন-ফুল দেখে সুধু চায় :
হ'তে তার ফুলদানি—
ওগো না-জানা দ্বীপের রাণী !"

বীরেনদা খপ্ ক'রে অমিয়ের চুল ধ'রে এক টান মেরে বললে, "তোমার ঐ রাবিস গান থামাও অমিয় ! তোমার গান শোনবার জন্যে আমার কোনই আগ্রহ নেই !"

আমি আওড়ালুম—

"প্রেম যার প্রথম দৃষ্টিতে,
সে বোকা লোক সৃষ্টিতে !"

বীরেনদা হার মেনে এককোণে গিয়ে ধুপ্ ক'রে ব'সে পড়ল।
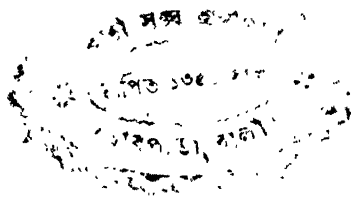
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

"বাংলাদেশের ছেলে"

আজ দুদিন এই ঘরে বন্দী হয়ে আছি। বাইরে দিন-রাত পাহারা, আমরা বেরুবার চেষ্টা করলেই জানোয়ারের সামিল এই বুনো মানুষ-গুলো বর্ষা উঁচিয়ে তেড়ে আসে।

এরা এর মধ্যে যে-সব খাবার পাঠিয়েছে তা স্পর্শ করবার ভরসা আমাদের হয় নি—কে জানে বাবা, তার ভিতরে সাপ-ব্যাং কী আছে, আমাদের মতন সভ্য মানুষের পেটে ঢুকে তারা যদি উল্টো-রকম উৎপাত সুরু করে তাহ'লে এই অমানুষের দেশে তার ঠ্যালা সাম্‌লাবে কে?···কাজেই পোঁট্‌লার ভিতরে যে সব চেনা খাবার ছিল তাই খেয়েই উদরস্থ অগ্নিদেবকে শীতল করছি।

তিনদিনের দিন সন্ধ্যেবেলায় হঠাৎ রাজবাড়ী থেকে আমাদের ডাক পড়ল।

রাজবাড়ীর গায়ে-লাগানো খানিকটা জমির উপরে অনেক ফুলগাছ বসানো হয়েছে। এই অসভ্যের মুল্লুকে বাগান রচনার চেষ্টা দেখে প্রথমটা আশ্চর্য্য হয়েছিলুম। কিন্তু তার পরেই বুঝলুম, নিশ্চয়ই রাণীর ইচ্ছাতেই এই বাগানের উৎপত্তি হয়েছে!

বাগানের মাঝখানে একখানা পাথরের বেদীর উপরে রাণী বসেছিলেন—তাঁর পরোণে ঠিক বাঙালীর মেয়েরই মতন কাপড়, কেবল গায়ে কোন

জামা ছিল না। পরে শুনেছিলুম, জামা আর কাপড় পরা নাকি এদেশে সমাজবিরোধী কাজ, তাই অনেক চেষ্টার পর রাণী সুধু কাপড় পরবার অধিকার পেয়েছিলেন!

রাণীকে দেখে আমরা নমস্কার করলুম। তিনিও প্রতি-নমস্কার ক'রে বললেন, "বসুন। কিন্তু আপনাদের ঐ ঘাসের ওপরেই বসতে হবে। এদেশে রাজা কি রাণীর সাম্‌নে কেউ আসনে বসতে পায় না!"

বীরেনদা ব্যস্ত কণ্ঠে সুধোলে, "এদেশের রাজা কে?"

রাণী বললেন, "রাজা কেউ নেই। আমি যে কুমারী!"

বীরেনদা যেন কতকটা আশ্বস্ত হয়ে মাটির উপরে ব'সে পড়ল!

আমি বললুম, "কিন্তু রাণীজী, আপনি কি ক'রে এখানে এলেন?"

—"অদৃষ্টের বিড়ম্বনায়। কতদিন আগে জানিনা—বোধ হয় দশ-বারো বছর হ'ল, আমি প্রথম এখানে এসেচি! আমার বাবা সায়েবদের ফৌযে কি কাজ করতেন। বাবা আর মায়ের সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে জাহাজে চ'ড়ে আমি চীনদেশে যাচ্ছিলুম। আমার বয়স তখন নয় বছর। সমুদ্রে হঠাৎ ঝড় উঠে আমাদের জাহাজকে বিপথে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেয়। বাবা আর মা কোথায় ভেসে গেলেন জানিনা, আমি, কিন্তু আর চ্যাং ব'লে এক চীনেম্যান, ভাসতে ভাসতে এই দ্বীপে এসে পড়ি।"

—"আপনার সঙ্গে চ্যাং ব'লে এক চীনেম্যান ছিল?"

—"হ্যাঁ।"

—"সে কি এখনো এখানেই আছে?"

—"না, শুনুন সব বলচি। দ্বীপের এই অসভ্যরা আমাদের দেখতে পেয়ে নিয়ে আসে। ঠিক সেই দিনই এদের রাজা কোন ছেলে-মেয়ে

না রেখেই মারা যান। আমাকে পেয়ে তারা ভাবলে যে, সাগর-দেবতা আমাকে তাদের কাছে উপহার পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাই পুরুতরা খুব খুসি হয়ে ঘটা ক'রে আমাকে তাদের সিংহাসনে বসালে।"

—"আর সেই চ্যাং?"

—"চ্যাংকে তারা প্রথমে জুজু-ঠাকুরের সাম্‌নে বলি দিতে চেয়েছিল।"

—"জুজু-ঠাকুর?"

—"হ্যাঁ, জুজু হচ্ছে এদের প্রধান দেবতা। জুজুর পুরুতরাই এখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা—আমাকেও তাদের হুকুম মেনে চলতে হয়।······তারপর, যে কথা হচ্ছিল। চ্যাংকে তারা বলি দিতে চাইলে। কিন্তু আমি অনেক কষ্টে চ্যাংকে বাঁচাই! চ্যাং কিছুদিন আমার সঙ্গে-সঙ্গেই রইল। কিন্তু তারপর হঠাৎ একদিন জুজুর মন্দির থেকে একখানা হীরে চুরি ক'রে কোথায় যে পালাল, আর তার কোনই খোঁজ পাওয়া গেল না।"

অমিয় বললে, "বোধ হয় সেই চ্যাঙের সঙ্গে আমাদেরও দেখা হয়েচে!"

রাণী বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায়?"

আমরা সব কথা খুলে বললুম।

রাণী চিন্তিত ভাবে বললেন, "চ্যাং তাহ'লে নিশ্চয়ই জুজুর মন্দির লুঠতে চায়! এই জুজুর মন্দিরে যত হীরে-মাণিক আছে পৃথিবীর কোন রাজার ঘরেও তা নেই।"

বীরেনদা বললে, "ভয় নেই, আমরা আপনাদের রক্ষা করব!"

রাণী মাথা নেড়ে বিষণ্ণ স্বরে বললেন, "চ্যাঙের হাত থেকে তো আপনারা আমাদের রক্ষা করবেন, কিন্তু তার আগে পুরুতদের হাত থেকে আপনাদের রক্ষা করবে কে ?"

—"সে আবার কি ?"

—"পুরুতরা যে জুজুর সাম্‌নে আপনাদেরও বলি দিতে চায় !"

আমরা সবাই চম্‌কে উঠলুম।

রাণী বললেন, "অবশ্য আপনাদের হয়ে আমি পুরুতদের কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করেচি ! আর আমার কথা শুনে তাদের মনও অনেকটা নরম হয়ে এসেছিল। কিন্তু কেবল একজন পুরুতের শত্রুতায় আমার চেষ্টা ফল হয় নি। আপনাদের ওপরে তার বিষম রাগ !"

—"কেন ?"

—"আপনারা যে এই দ্বীপে এসেছেন, তার কাছ থেকেই সে-খবর আমরা প্রথমে পাই। তার একখানা হাত ভয়ানক জখম হয়েচে, আপনারাই নাকি তার সেই দুর্দ্দশা করেচেন।"

অন্ধকার বনে সেই জ্বলন্ত চোখ আর পাহাড়ের গুহায় সেই সাংঘাতিক হাতের আবির্ভাবের সকল রহস্য এতক্ষণে বুঝতে পারলুম !

আমি বললুম, "কিন্তু রাণীজী, সে যে গায়ে প'ড়ে আমাদের আক্রমণ করেছিল ! আর একটু হ'লেই সে যে আমাদের একজনকে খুন করত !"

রাণী বললেন, "বুঝেচি, ঐ পুরুতগুলো যে কি-রকম নিষ্ঠুর আর সয়তান আমি তা জানি,—তাদের প্রধান আনন্দই হচ্ছে নরহত্যা করা, বলি দিয়ে তারা মানুষের মাংস খায়। পুরুতরা এখন বলচে, একবার আমার

কথায় চ্যাংকে ছেড়ে দিয়ে তারা ঠকেচে, আর তারা ঠক্‌তে রাজি নয়। এ-রাজ্যে তারা কোন বিদেশীকে থাকতে দেবে না, তারা আপনাদের ধ'রে বলি দেবেই দেবে!"

বীরেনদা বললে, "বেশ, তারা চেষ্টা ক'রে দেখুক না! আজ থেকেই তাহলে আমরা নিজমূর্ত্তি ধরব—বাহুবলেই আমরা আত্মরক্ষা করব!"

রাণী ম্লান হাসি হেসে বললেন, "হাজার হাজার লোকের ভিতরে আপনাদের তিনজনের বাহুবলের দাম কতটুকু?"

—"আমাদের বুদ্ধি আছে, আমাদের বাহুবল আছে, আমাদের বন্দুক আছে—বন্দুকের শক্তি ওরা না জানুক, আপনি জানেন তো?"

—"জানি। কিন্তু অকারণে বিপদকে ডেকে এনে রক্তপাত ক'রে লাভ কি? তার চেয়ে কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করবার চেষ্টা করুন।"

—"কি কৌশল, আপনি বলুন।"

—"এই অসভ্যরা যেমন হিংসুক, তেমনি আবার ছেলেমানুষের মতন সরল আর ভীতু। যা অসম্ভব—অর্থাৎ এদের কাছে যা অসম্ভব, তা যদি কেউ সম্ভব ক'রে তুলতে পারে, তার কাছে এরা কুকুরের মতন পোষ মানে।"

—"কিন্তু আমাদের কি করতে হবে?"

—"এখানে সব-চেয়ে আদর পায় যাদুকররা। যাদুকরদের এরা ভয়ও করে, পূজাও করে। আপনারা কেউ কি কোনরকম ছোটখাটো ম্যাজিক-ট্যাজিক জানেন না?"

বীরেনদা বললে, "দাঁড়ান, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এখানে কি বাইরের সভ্যদেশ থেকে মাঝে মাঝে লোকজন আসে?"

—"কৈ, আমি তো দেখিনি। এই দ্বীপের বাইরে যে দেশ আছে, তাও এরা জানে না। তবে আমি এখানে থাকতে থাকতেই অনেক বছর আগে বোধ হয় একখানা জাহাজ এখানে এসে একদিনের জন্যে নঙর করেছিল। অসভ্যরা তাকে দেখে ভারি ভয় পেয়েছিল, আমার কাছে এসে সেই জাহাজকে সাগর-দানব ব'লে বর্ণনা করেছিল। আমার বিশ্বাস, চ্যাং পালিয়েছিল সেই জাহাজে চ'ড়েই।"

বীরেনদা বললে, "বেশ, তাহ'লে আমি এদের গোটাকয়েক ম্যাজিক দেখাতে রাজি আছি।"

রাণী বললেন, "তাহ'লে আর কিছু ভাবতে হবে না। আপনাকে এরা ঠিক জ্যান্ত জুজু-ঠাকুরেরই মতন পূজা করবে। তাহ'লে আজকেই আমি ঘোষণা ক'রে দেব যে, যে-স্বর্গে জুজু-ঠাকুর থাকেন, আপনারা সেই স্বর্গ থেকেই জুজুর ভক্তদের সঙ্গে দেখাশুনো করতে এসেচেন। কাল সকালে রাজবাড়ীর সামনের মাঠে আপনারা সকলকে আশীর্ব্বাদ করবেন, আর নিজেদের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাবেন। কেমন, আপনারা মান রাখতে পারবেন তো? কারণ এর ওপরেই আপনাদের জীবন-মরণ নির্ভর করচে।"

বীরেনদা বললে, "এরা যখন বাইরের জগতের কিছুই জানে না, তখন আমি নিশ্চয়ই এদের ভড়্‌কে দিতে পারব!"

রাণী আর কিছু না ব'লে হাততালি দিলেন, তখনি একজন লোক এসে হাজির হ'ল। রাণী খানিকক্ষণ ধ'রে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন। কথা কইতে কইতে লোকটা সভয়ে ও সবিস্ময়ে বার বার

আমাদের পানে তাকিয়ে দেখতে লাগল—আমরা বুঝলুম, এর মধ্যেই তার চোখে আমরা অনেকটা উঁচু হয়ে উঠেছি!

কথাবার্ত্তা শেষ হ'লে পর লোকটা রাণীকে আর আমাদের মাটিতে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে চ'লে গেল।

রাণী আমাদের দিকে ফিরে হাসতে হাসতে বললেন, "এতক্ষণে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। তাহলে কাল সকালেই সময় ঠিক রইল।……আসুন, এইবারে আমরা গল্প করি!"

অমিয় বললে, "রাণীজী, আপনার নামটি তো এখনো আমাদের বলেন নি?"

—"আমার নাম? বিজয়া। আমি বিজয়ার দিনে জন্মেছিলুম ব'লে বাবা আমার ঐ নাম রেখেছিলেন।" খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তিনি আবার বললেন, "আপনাদের পেয়ে যে আমার কি আহ্লাদ হয়েচে, মুখ ফুটে আমি তা বলতে পারব না! দেশের কথা আজ আমার কাছে স্বপ্নের মতন হয়ে গেছে, এ জীবনে হয়তো আর দেশে ফিরতেও পারব না। আর ফিরবই বা কার কাছে, আমার মাও নেই—বাবাও নেই।"

বীরেনদা বললে, "আমাদের দশা আরো খারাপ। দেশে আমাদের সব আছে, আমরা কিন্তু কোনদিন আর সেখানে ফিরতে পারব না!"

আমি মুখে আর কিছু বললুম না, কিন্তু আমার বুক ঠেলে কান্না জেগে উঠল।

অমিয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "আজ এই দূর বিদেশে বনের মাথায় যে চাঁদ উঠেচে, তার আলো আজ আমাদের বাংলাদেশেরও

বুক্‌কে ভরিয়ে তুলেচে। চাঁদের চোখে আজ বাংলাদেশের ছবি লেখা, কিন্তু আমাদের চোখে সুধু্‌ অন্ধকার!”

রাণী মমতা-মাখানো গলায় বললেন, “মিছে ভেবে মন খারাপ করবেন না। তার চেয়ে আপনাদের কারুর গান জানা থাক্‌লে আমাকে বাংলাদেশের একটি গান শোনান।”

বীরেনদা বললে, “অমিয় হচ্ছে আমাদের ছোট্ট দলের বাঁধা-গাইয়ে। গাও অমিয়!”

অমিয় গাইলে :—

আমরা সবাই বাংলাদেশের ছেলে রে ভাই,
বাংলাদেশের ছেলে!
দিবস-রাতে মোদের আঁতে যাচ্চে কতই
চন্দ্র-তপন খেলে।
মা-বোন-বধূ্‌ আদর বিলায় ঘরে,
বাইরে বাতাস ঝঙ্কারে কাণ ভরে,
ফুল-রাগিণী শোনায় চাঁপা, অশোক, বকুল
গহন-বনেও গেলে।
চাঁদ্‌নি-মাখা নদীর ধারে ধারে,
ধানের ক্ষেতে কনক ভারে ভারে,
তেপান্তরেও মাঠ-ভরা ঘাস ছায় যে বুকে
শ্যাম্‌লা হাসি ঢেলে!
কোকিল, শ্যামা আর পাপিয়ার সুরে
গানের স্বপন জাগে মানসপুরে,

নাম্‌লে আঁধার পল্লীবালা তুল্‌সী-তলায়
ছায় গো পিদিম জেলে।
গাঙের জলে ভাটিয়ালির স্বরে
মাঝীরা সব দেব্‌তাদের নাম করে,
অনন্তেরি নিত্যপূজা মন্দিরে হয়—
সন্ধ্যেবেলা এলে।
গঙ্গাতীরের মিষ্টি-নরম মাটি,
তার ওপরেই আমরা সবাই হাঁটি,
সেই মাটিতেই মানুষ মোরা, চাইনা স্বরগ
মাটির বাংলা ফেলে।

সাম্‌নেই খানিক-স্পষ্ট, খানিক-অস্পষ্ট পাহাড়ের পর পাহাড়ের শিখর ক্রমাতিউচ্চ হয়ে নীলাকাশের সোপানশ্রেণীর মতন উপর-পানে উঠে গিয়েছে এবং তারই সব-চেয়ে-উঁচু শিখরের উপরে মুকুটের মতন জেগে রয়েছে, জ্বলন্ত চাঁদ। এই সুদূর বিদেশের বাগান থেকে অজানা সব ফুলের গন্ধ জেগে উঠে মনের ভিতরে মাদকতার আবেশ এনে দিচ্ছিল এবং রাণী বিজয়াকে দেখাচ্ছিল, যেন এক জ্যোৎস্নাগড়া দেবী-প্রতিমার মত।

এরই ভিতরে অমিয়ের গান আজ বাংলার কোকিল-পাপিয়ার অভাব পূরণ করলে—আমাদের মনে হ'তে লাগল, আমরা যেন আবার সেই বাংলাদেশের সবুজ কোলের ভিতরেই আপন-জনের কাছে ব'সে আছি!

বীরেনদার স্তব্ধতা ক্রমেই বিস্ময়কর ও সন্দেহজনক হয়ে উঠছে!

সে নির্ব্বাকভাবে ঘাসের উপরে গা বিছিয়ে দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ছিল; নিষ্পলক নেত্রে।

অমিয়ের গান থেমে গেল। রাণী কিছুক্ষণ মৌন থাক্‌বার পর ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে বললেন, "অমিয়বাবু, আজ আপনার গান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েচে, আমি বিদেশে আছি। অনেক—অনেক বছর পরে আমার মনের ভিতর থেকে আজ এই প্রবাসের দুঃখ মুছে গেল। এই আনন্দের জন্যে আমি আপনাদের সকলকেই প্রণাম করি।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

'ভানুমতীর খেল'

পরের দিন খুব সকাল-বেলায় ঘুম থেকে উঠেই দেখি, আমাদের ঘরখানা জনতায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে!

ঘরের ভিতরে লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন। সকলেরই মুখ অত্যন্ত গম্ভীর এবং সকলেরই দেহ কাঠের পুতুলের মতন অত্যন্ত আড়ষ্ট।

প্রথমটা আমার বুক যেন ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল! কে এরা? সেই হতভাগা জুজুর কাছে এরা কি আমাদের মুণ্ডগুলোকে ধড় থেকে আলাদা করবার জন্যে নিয়ে যেতে এসেছে? ধড়মড়িয়ে উঠে ব'সে পাশ থেকে বন্দুকটা তুলে নিলুম। কিন্তু তার পরেই দেখলুম, বিছানার উপরে বীরেনদা আর অমিয় অত্যন্ত প্রশান্ত মুখে গদীয়ানি চালে ব'সে রয়েছে।

বীরেনদা শান্তভাবে হেসে বললে, "ভয় নেই সরল-ভায়া! তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পেরেচি। কিন্তু এদের দেখে তুমিও কি বুঝতে পারচ না যে, এরা হচ্ছে সেই জুজুর ত্যাঁদড় পুরুতের দল? এরা বোধ হয় আমাদের নিয়ে যেতে এসেচে।"

ঘরের লোকগুলোর দিকে ফিরে দেখলুম, এদের সাজগোজ এখানকার সাধারণ লোকগুলোর মতন নয়। এদের মাথায় রয়েছে পাখীর পালোকের মুকুট, সর্ব্বাঙ্গে আঁকা নানান-রকম অদ্ভুত উল্কি, হাতে বর্শা

বা ধনুকের বদলে এক-একটা কালো রঙের লাঠি এবং কোমরে লেংটির বদলে বাঘের ছাল।

লোকগুলোর চোখে কোনরকম বন্ধুত্বের ভাব না মাখানো থাক্‌লেও ভয়, সম্ভ্রম অথচ অবিশ্বাসের আভাস যেন রীতিমতই পাওয়া গেল।

আমাদের সকলকে জেগে উঠতে দেখে তারা হাত তুলে দরজার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করলে।

বীরেনদা বললে, "সরল! অমিয়! তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়। মুখ-হাত-পা ধুয়ে নাও। তারপর আমাদের কার্দ্দানি দেখিয়ে এই ব্যাটাদের চক্ষু স্থির ক'রে দেব!"

* * *

রাজবাড়ীর সাম্‌নের মাঠে গিয়ে দেখি, লোকে লোকারণ্য! মস্ত মাঠ, প্রায় মাইল-খানেক লম্বা। চওড়াতেও সেইরকম। কিন্তু অত-বড় মাঠেও আজ তিলধারণের ঠাঁই নেই। এ-রাজ্যের ছেলে-বুড়ো-মেয়ে যেখানে যে ছিল, সবাই আজ এইখানে এসে জুটেছে। মাঠ ভ'রে কিল্‌বিল্‌ করছে কালো কালো সব ভূত-পেত্নীর মতন অগুন্তি চেহারা! নজরে যতখানি পড়ল—প্রত্যেকেরই মুখ ভয়, সম্ভ্রম আর কৌতূহলে ভরা!

মাঠের মাঝখানে একটা উঁচু মাঁচার মতন করা হয়েছে, সেইখানেই আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান। রাণী বিজয়াও সেই মাচার উপরে ব'সে আছেন, তিনি আজ আমাদের মধ্যস্থ হবেন,—অর্থাৎ আমাদের কথা সকলকে বুঝিয়ে দেবেন।

মাঁচার তলাতেই প্রায় চার-পাঁচশো লোক রয়েছে, তাদের সকলেরই

সাজগোজ আমাদের ঘরে আজ সকালে যাদের দেখেছি, তাদেরই মতন। বুঝলুম, এরা হচ্ছে এই রাজ্যের পুরোহিতের দল। ভালো ক'রে চেয়ে দেখলুম, প্রত্যেক মুখেই ঘৃণা ও অবিশ্বাসের আভাস! আমাদের ভেল্কীবাজি যদি তাদের মনের মতন না হয়, তাহ'লে আমাদের অবস্থাও যে আরামদায়ক হবে না, তাও বেশ বোঝা গেল।

আচম্বিতে শিঙা ও দামামা বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রাণী বিজয়া উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "বীরেনবাবু, এইবারে আপনার ম্যাজিক সুরু করুন—যদিও সে ম্যাজিক দেখে আমি ভুলব না!"

বীরেনদা উঠে দাঁড়াল। একবার লোক ভুলোবার জন্যে আকাশ পানে মুখ ও হাত তুলে চোখ মুদে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর মুখে গাম্ভীর্য্যের বোঝা নামিয়ে প্রাণপণে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে চেঁচিয়ে, হাত-পা ছুঁড়ে বললে, "ওরে অসভ্য বনমানুষের দল! তোরা নাকি আমাদের বলি দেবার মৎলোব করেচিস? তোরা কি জানিস যে, আমরা একটা ক'ড়ে আঙুল তুললে তোরা সবাই এখনি ভগবান জুজুর অভিশাপে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবি! তোরা আমাদের ক্ষমতা দেখতে চাস্? বেশ, তবে তাই ছাখ্! এই চেয়ে ছাখ্, আমার হাতে একটা জিনিষ রয়েচে। এই জিনিষের গুণে চন্দ্র-সূর্য্য, পাহাড় আর সুদূরের সমস্ত দৃশ্য আমাদের কাছে এসে ধরা দেবে। যদি বিশ্বাস না হয়, জুজুর প্রধান পুরোহিত আমার কাছে আসুক, স্বচক্ষে সে আমার ক্ষমতা দেখে যাক্।"

বীরেনদার হাতের জিনিষটা আর কিছুই নয়, দূরবীণ।

রাণী বীরেনদার কথাগুলো সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন। জুজুর প্রধান

পুরোহিতের মুখে বিস্ময় আর সন্দেহের ভাব ফুটে উঠল। পায়ে পায়ে থতমত খেয়ে সে আমাদের কাছে এগিয়ে এল। বীরেনদা দূরবীণটা তার চোখের সাম্‌নে ধরলে। দূরবীণের ভিতর দিয়ে মিনিটখানেক বাইরের জগৎ দেখেই বড় পুরুতের গা ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল—তাড়াতাড়ি দূরবীণ থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে সে আগে হতভম্বের মতন আমাদের মুখের পানে তাকিয়ে দেখলে, তারপর দুর্ব্বোধ ভাষায় কি-একটা চীৎকার করতে করতে দ্রুতপদে পুরুতদের দলের ভিতরে গিয়ে ঢুকে প'ড়ে কোথায় গাঢাকা দিলে।

রাণী আমাদের দিকে ফিরে বললেন, "ও বলচে আপনারা সবাই 'স্বর্গীয় যাদুকরের বাচ্ছা'!"

তারপর দ্বিতীয় 'ম্যাজিকে'র পালা হচ্ছে আমার। একখানা আতসী কাঁচ সকলের চোখের সাম্‌নে উঁচু ক'রে তুলে ধ'রে আমি চেঁচিয়ে বললুম, "হে জুজুর ভক্তবৃন্দ! তোমরা সবাই শোনো। আমার হাতে এই যে পবিত্র জিনিষটি দেখচ, বহুপুণ্যফলে এটি আমি লাভ করেচি। এর মহিমায় স্বয়ং সূর্য্যদেব আমাদের বশীভূত হয়েচেন। এখন আমি আদেশ করলে তিনি আমার সমস্ত শত্রুকে ভস্মীভূত ক'রে ফেলবেন। তোমাদের কেউ যদি পরীক্ষা করতে চাও, তাহ'লে এগিয়ে এস,—আমি তার শরীরের যে-কোন স্থানে ভয়ানক আগুন জ্বেলে দেব!"

রাণী আমার কথার পুনরাবৃত্তি করলেন, কিন্তু বিপুল জনতা আতঙ্কে একেবারে স্থির হয়েই রইল, একজন লোকও সাহস ক'রে অগ্রসর হ'ল না।

তখন আমি আর কিছু না ব'লে একখানা শুক্‌নো পাতা কুড়িয়ে নিয়ে তারই উপরে আতসীকাঁচ ধ'রে সূর্য্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করলুম। পাতা-খানা যেই দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠল, সমস্ত মাঠের লোক একসঙ্গে চীৎকারের পর চীৎকার করতে লাগল—সে ভীষণ চীৎকারে কাণ যেন ফেটে যাবার মতন হ'ল !

চীৎকার থাম্‌লে পর তৃতীয় 'ম্যাজিক' দেখালে অমিয়। প্রথমে সে একটা দেশলাইয়ের বাক্স সকলকে দেখালে। তারপর বললে, "এই যে পবিত্র দ্রব্য, এটি ভগবান জুজু নিজে আমাকে দান করেচেন। এর সঙ্গে সর্ব্বগ্রাসী অগ্নিদেব আমার কাছে বন্দী হয়ে আছেন। এই দেখ তার প্রমাণ"—ব'লেই সে ফস্ ক'রে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ফেল্‌লে।

তারপর আবার সেই চীৎকার আর চীৎকার !

পুরুতদের পানে তাকিয়ে দেখলুম, তারাও চীৎকার করছে না বটে, কিন্তু তাদের সকলকার চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত, মুখ ভয়ে বিবর্ণ !

তারপর আমরা তিনজনেই নিজের নিজের বন্দুক তুলে নিলুম।

বীরেনদা বললে, "এইবারে তোমরা আমাদের আর এক শক্তি দেখ ! আহাদের হাতে এই যে তিনটি জিনিষ দেখচ, এগুলি হচ্ছে আকাশের বজ্র। ভগবান জুজু এই বজ্রের দ্বারা শত্রুবধ ক'রে থাকেন। এরই দ্বারা আমরা সেদিন জুজুর এক অবাধ্য পুরুতের হাত ভেঙে দিয়েচি—দয়া ক'রে তার প্রাণটা আর নিই নি !"

সাম্‌নের একটা গাছের উঁচু ডালে একঝাঁক শকুনি ব'সেছিল। আমরা প্রত্যেকেই তাদের এক-একটাকে লক্ষ্য ক'রে বন্দুক তুললুম।

ঘোড়া টেপার সঙ্গেসঙ্গেই তিনটে বন্দুক গর্জ্জন ক'রে উঠল এবং পর-মুহূর্ত্তে তিনটে শকুনি ঘুরতে ঘুরতে মাটির উপরে প'ড়ে গেল।

বিপুল জনতার ভিতর থেকে এবারে যে ভয়ার্ত্ত চীৎকার উঠল, তার আর তুলনা নেই। তারপরেই সেই হাজার হাজার লোক মাঠের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে প'ড়ে আমাদের উদ্দেশে ভক্তিভরে বার বার প্রণাম করতে লাগল।

বীরেনদা বললেন, "হে জুজুর প্রিয় সন্তানগণ! তোমাদের কোন আশঙ্কা নেই। তোমরা যদি আমাদের অনুগত থাকো, তাহ'লে আমরা তোমাদের মঙ্গল করব। কিন্তু আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করলে আমাদের এই বজ্র তোমাদের কারুকেই ক্ষমা করবে না, অতএব সাবধান, সাবধান, সাবধান!"

তারপরেই জুজুর পুরুতের দল এগিয়ে এসে মঞ্চের সামনে দুই হাত তুলে, মাথা হেঁট ক'রে হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়ল।

রাণী বললেন, "পুরুতরা স্বীকার করচে, আজ থেকে ওরা আপনাদের দাস হয়ে রইল। আপনারা হাত তুলে ওদের অভয় দিন!"

আমরা অভয় দিলুম!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মৃত্যু-যুদ্ধ

এই যে বিজয়া মেয়েটি, আমাদের সকলেরই চোখে একে বড় মিষ্টি লাগল।

দেশে যে-সব মেয়ে ছিল আমাদের চেনা, তাদের সঙ্গে বিজয়ার কিছুই মেলে না—সে বাঙালীর মেয়ে, ঐ পর্য্যন্ত! আর তার কারণও বোঝা শক্ত নয়। বাল্যবয়স থেকেই সে এই অসভ্যদের দলের ভিতরে বন্য প্রকৃতির মাঝখানে মানুষ হয়েছে—আদব-কায়দা বা সামাজিকতা, কিছুই সে শেখেনি এবং যেটুকু শিখেছিল তাও বোধ হয় ভুলে গিয়েছে। তাই বাঙালী পুরুষদেরও চেয়ে সে বেশী সপ্রতিভ এবং বেশী স্বাধীন—পাঁচজন সভ্য মানুষের সঙ্গে মিশতে গেলে মানুষের যেটুকু আত্মগোপন করার দরকার হয়, সেটুকু খল-কপটতাও তার কথায় বা ব্যবহারে বা ভাব-ভঙ্গিতে ছিল না!

ফলে দিন-দশেকের ভিতরেই বিজয়া আমাদের সঙ্গে একেবারে আমাদেরই মতন হয়ে মিলে-মিশে গেল—আমরা যে যুবক এবং সে যে রূপসী যুবতী, তার ভাব দেখলে মনে হ'ত, এ সঙ্কোচ তার মনের ভিতরে যেন একবারও উঁকি দেয় নি।

সে আমাদের নাম ধ'রে 'তুমি' ব'লে ডাকতে সুরু ক'রেছিল

এবং আমাদেরও মানা ক'রে দিয়েছে, আমরাও যেন তার 'রাণী' উপাধি বাদ দিয়ে নাম ধ'রে তাকে ডাকি!

এমন এক কল্পনাতীত অবস্থায় তিন যুবকের ভিতরে একটিমাত্র যুবতী এসে পড়লে ঔপন্যাসিকরা কত-রকম 'মেলো-ড্রামাটিক' ঘটনার সরস কল্পনা করতে পারতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের এই মেলা-মেশার ভিতরে এখন পর্য্যন্ত কোন বিচিত্র 'রোম্যান্স' বা ঐ-জাতীয় আর কোন-কিছুর দেখা পাওয়া যায় নি।

তবে 'রোম্যান্সে'র একটা সন্দেহজনক ছায়া বোধ হয় বীরেনদা আর বিজয়ার মাথার উপরে দুলছে—যদিও সে ছায়াকে এখনো কায়া ব'লে ভ্রম হয় না।

ওরা দুজনেই চুরি ক'রে পরস্পরের দিকে চায় এবং পরস্পরের সঙ্গে চোখোচোখি হ'য়ে গেলেই লজ্জা পেয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এক নম্বরের প্রমাণ।

বিজয়ার অবর্ত্তমানে বীরেনদা খালি তার নাম করে এবং বীরেনদার অবর্ত্তমানে বিজয়াও করে ঘন ঘন তারই নাম। দু নম্বরের প্রমাণ।

দুজনকে খুসি করবার জন্যে ওদের দুজনেরই কী প্রাণপণ চেষ্টা! এবং পরস্পরের মুখের তুচ্ছ কথাও মনের মতন না হ'লে, ওরা দুজনেই অসম্ভব-রকম অভিমান ক'রে বসে। এই হ'ল তিন নম্বরের প্রমাণ।

এরং আরো ঢের প্রমাণ আছে। অলক্ষ্যে থেকে ফুলবাণ ছোঁড়ার বদ-অভ্যাসের জন্যে যে-দেবতাটি অত্যন্ত বিখ্যাত, তবে কি তিনি এর-মধ্যেই আমাদের ভিতরে তাঁর শিকারকে খুঁজে পেয়েছেন?

বীরেনদাকে এ-রকম কোন প্রশ্ন করলেই সে ভারি খাপ্পা হয়ে ওঠে। আজকাল আবার বলতে সুরু করেছে যে, "দেখ, তোমরা যদি এমন ফাজ্‌লামি কর, তাহ'লে এবার আমি গায়ের জোরে তোমাদের মুখ বন্ধ করব!"

অমিয় বলে, "বীরেনদা! ইংরেজরা বছরে বছরে এত লোককে ফাঁসি দিয়েও আর জেলখানায় পাঠিয়েও দুর্ব্বল ভারতবাসীর মুখ গায়ের জোরে বন্ধ করতে পারলে না। গায়ের জোরে তুমিই বা কেমন ক'রে আমাদের মুখ বন্ধ করবে?... ... ... সত্যি বীরেনদা, তোমার পায়ে পড়ি, বলনা, তুমি কাকে ভালোবাসো?"

বীরেনদা রেগে তিনটে হয়ে চেঁচিয়ে বলে, "কারুকে না, কারুকে না,—আমি ভালোবাসি খালি নিজেকে!"

অমিয় চোখে দুষ্টুমির ভাব আর গলায় অভিমানের স্বর এনে বলে, "ছিঃ বীরেনদা, ছিঃ! তুমি তাহ'লে আমাদেরও ভালোবাসো না?"

—"না, না! আমি তোমাদের ঘৃণা করি!"

অমিয় কোমরে হাত দিয়ে নাচতে নাচতে গান সুরু ক'রে দেয়:—

হায় রমণীর চোখ!
তোমার তরে বন্ধু হ'ল
বিষম শত্রুলোক!
চোখের চাকর করলে যাকে
ভগবানও পান্‌না তাকে,

বিজয়া

এই ছুনিয়ায় সব ছেড়ে তার
তোমার পরেই ঝোঁক্ !

বীরেনদা তখন হার মেনে সেখান থেকে স'রে পড়ে !

•　　　°　　　°　　　°

সমুদ্রে চাঁদ উঠছে। মনে হচ্ছে, ঐ সমুজ্জল রত্ন-গোলকই যেন সমস্ত আকাশ আর পৃথিবীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র, নিখিল মানবের চিত্ত তাই নিত্য ওরই মধ্যে গিয়ে আলোক-শয্যায় শুয়ে থাকতে আর অনন্ত আনন্দের স্বপ্ন রচনা করতে চায়।

সমুদ্রে চাঁদ উঠছে। আর বিপুল সমারোহে ভরা সেই অসীম নীলজলের জগৎ গলিত হীরকস্রোতে পরিণত হচ্ছে।

সমুদ্রে চাঁদ উঠছে। আর জ্যোৎস্না-নির্ঝরে আমাদের মনের ভিতরটা পর্য্যন্ত রূপে অপরূপ হয়ে যাচ্ছে। এবং প্রাণ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে চাইছে, মাটি-মায়ের উদার কোলে, এই সুন্দর পৃথিবীতে আমরা যে বেঁচে আছি, আমরা যে খেলা করছি, এর চেয়ে বড় কথা কিছু নেই, আর কিছু নেই !

বালির নরম বিছানায় আমরা তিনজনে ব'সে আছি আর বিজয়া ছিল উপুড় হয়ে শুয়ে—তুই কনুইয়ে ভর দিয়ে দেহের উপরার্দ্ধ তুলে !

অজানা দ্বীপের নাম-না-জানা পাখী নিজের ভাষায় কি গান গাইছিল এবং বাতাস করছিল তীরের সবুজ বনের সঙ্গে প্রেমালাপ।

বীরেনদার চোখের দৃষ্টি আজ অনন্ত সাগরের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে !

বিজয়া খানিকক্ষণ অবাক হয়ে বীরেনদার মুখের পানে তাকিয়ে রইল; তারপর পাত্‌লা ফুলের পাপ্‌ড়ির মতন ঠোঁটদুখানি মধুর হাসিতে রঙিন্ ক'রে তুলে বললে,"বীরেন, কি ভাব্‌চ ভাই?"

বীরেনদা চম্‌কে মুখ ফেরালে; একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "দেশের কথা।"

—"কেন ভাই তোমরা খালি দেশের কথা ভাবো? আমার কাছে থাক্‌তে কি তোমাদের ভালো লাগে না?"

—"কেন ভালো লাগবে না বিজয়া! খুব ভালো লাগে। কিন্তু সোনার খাঁচায় ব'সে বনের পাখী মনের সুখে গান গাইলেও সে কি বনের স্মৃতি মনের ভিতর থেকে মুছে ফেল্‌তে পারে?"

বিজয়া আর কোন জবাব দিলে না।

অমিয় আনমনে গুণ্‌ গুণ্‌ ক'রে গাইতে লাগ্‌ল :—

আজ আকাশের রূপ-সায়রে
যায় ভেসে যায় আঁখি,
মনকে কে আজ দেয় পরিয়ে
রাঙা ফুলের রাখী!

* * * *

কোন্ রূপসী দৃষ্টি-বীণায়
নীরব গানের ছন্দ শোনায়,
চিত্ত আমার নৃত্য করে
স্বপ্নপুলক মাখি!

তারার মালা পর্‌বে ব'লে
ছুট্‌ল চাঁদের ঘুম,
বনের ছায়ায় উঠ্‌ল বেজে
ঝিল্লীর ঝুম্‌ঝুম্‌!

* * * *

শ্যামল ধরায় আলোয় আলো!
কে আজ আমায় বাস্‌বে ভালো!
তাই তো আমি মনে মনে
নাম ধ'রে তার ডাকি!

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল! তারপর বিজয়া আবার বীরেনদাকে সুধোলে, "আচ্ছা ভাই, আজ যদি এখানে হঠাৎ কোন জাহাজ এসে পড়ে, তাহ'লে তোমরা কি কর ?"

—"দেশে চ'লে যাই।"

—"আমাকে এখানে ফেলে ?"

—"তোমাকে ফেলে যাব কেন ? তোমাকেও নিয়ে যাব!"

বিজয়া দুঃখিত ভাবে মাথা নেড়ে বললে, "বলেচি তো ভাই, দেশের দরজা আমার সাম্‌নে বন্ধ। সেখানে আপন বলতে আমার আর কেউ নেই!"

—"কেন, আমরা তো আছি বিজয়া! আমাদের কাছে তুমি থাক্‌বে!"

—"তোমাদের সমাজ আর আমাকে চাইবে কেন? এই বুনোদের সঙ্গে থেকে আমার যে জাত গিয়েচে।"

—"মানুষের জাত কখনো যায় না বিজয়া! মানুষ—"

বীরেনদার মুখের কথা মুখেই রইল—হঠাৎ চারিদিক কাঁপিয়ে একসঙ্গে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটা বন্দুক গর্জ্জন ক'রে উঠল!—তারপরেই অসংখ্য লোকের চীৎকার ও আর্ত্তনাদ এবং তারপর আবার বন্দুকের পর বন্দুকের আওয়াজ!

আমরা সকলেই একলাফে দাঁড়িয়ে উঠলুম!

বিজয়া ভয়ে আঁৎকে ব'লে উঠল, "ও কিসের গোলমাল? অত বন্দুক কে ছোঁড়ে?"

গ্রাম থেকে আমরা খানিক তফাতে এসেছি। সমুদ্রতীর আর গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাঁচিলের মতন গাছের সারি। কিন্তু গাছগুলোর পাতার ফাঁক দিয়ে দাউ-দাউ-দাউ আগুনের রাঙা হাসি ফুটে উঠল আচম্বিতে। বেশ বোঝা গেল, গ্রামের ভিতরে একটা বিপুল অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়েছে!......বন্দুকের শব্দ সমান চলছে—মানুষের আর্ত্তনাদ ক্রমেই বেড়ে উঠছে!

বিজয়া বললে, "গাঁয়ে আগুন লেগেচে! আমার প্রজারা কাঁদচে!"—সে ছুটে গাঁয়ের দিকে যেতে গেল!

বীরেনদা এগিয়ে তার একখানা হাত চেপে ধ'রে বললে, "কোথা যাও? দাঁড়াও!"

বিজয়া আকুল স্বরে বললে, "ছাড়ো বীরেন, হাত ছাড়ো! দেখ্‌চ না, আমার প্রজারা বিপদে পড়েচে? তোমরাও চল!"

বীরেনদা মাথা নেড়ে বললে, "তুমিও যাবে না, আমরাও যাব না। যেচে মরণের মুখে গিয়ে লাভ কি! বুঝচ না, বোম্বেটে চ্যাঙের দল

জুজুর মন্দির আক্রমণ করেচে? ওরাই বন্দুক ছুঁড়চে আর সকলের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েচে!"

বিজয়ার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। একটু থেমে বললে, "তুমি ঠিক বলেচ। এতক্ষণে ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেচি। কিন্তু উপায় কি? চ্যাং আমার নিরীহ প্রজাদের খুন করবে, আর আমরা এখানে হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকৃব? তা তো হয় না! তার চেয়ে আমি চ্যাঙের কাছে মিনতি ক'রে বলিগে, 'একবার আমি তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলুম, আজ তুমি আমার কথায় আমার প্রজাদের ক্ষমা কর!' সে আমার কথা শুনবে বোধ হয়!"

—"সে তোমার প্রজাদের ক্ষমা করবার জন্যে এতদূরে আসেনি বিজয়া! চ্যাংকে এখনো তুমি চেনোনি—মানুষের আকারে সে রাক্ষস। তার কাছে গেলে তুমি নিজেও বিপদে পড়বে!"

বিজয়া দৃপ্তকণ্ঠে বললে, "তাহ'লে চল, আমরাও তাকে বাধা দেব!"

বীরেনদা অনুশোচনার স্বরে বললে, "তাকে বাধা দেবার উপায় থাকলে আমরাই কি এতক্ষণ এখানে থাকতুম? দেখচ না, আমরা বন্দুক আনিনি যে! এখন বন্দুক আনতে গেলেই বন্দী হব!"

বিজয়া হতাশ ভাবে ব'সে পড়ল। অগ্নিশিখায় তখন আকাশের একদিক লাল হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু বন্দুকের শব্দ ক'মে এল। গোলমালও অনেকটা থেমে এসেছে—কেবল শোনা যেতে লাগল, কতকগুলো লোক চীৎকার ক'রে কাঁদ্‌ছে!

আমি বললুম, "বিজয়া, তোমার সমস্ত প্রজা এতক্ষণে নিশ্চয়ই পালিয়ে গিয়েচে। কাঁদচে খালি আহতেরা।"

অমিয় বললে, "আঃ, হাত-দু'খানা যে নিস্‌পিস্ করচে! বন্দুক না এনে কী বোকামিই করেচি, চীনে-বাদরগুলোকে দেখিয়ে দিতুম মজাটা!"

বীরেনদা বললে, "ভুল আর শোধরাবার উপায় নেই।......কিন্তু আমাদের পক্ষে আর এখানে থাকাও নিরাপদ নয়।"

বিজয়া বললে, "চ্যাং ভাবচে জুজুর মন্দির লুট ক'রে রাজার ঐশ্বর্য্য পাবে! কিন্তু তার সে আশায় আমি ছাই দিয়ে এসেচি!"

—"কি-রকম?"

—"তোমাদের মুখে যখনি শুনলুম দলবল নিয়ে চ্যাং আবার এই দ্বীপে এসেচে, তখনি আমি সাবধান হয়েচি। জুজুর সমস্ত ধনরত্ন আমরা এক লুকনো জায়গায় পুঁতে রেখেচি—চ্যাং সারাজীবন ধ'রে খুঁজলেও তা পাবে না!"

বীরেনদা বললে, "তাহ'লে চল চল, আমাদের আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকা উচিত নয়! জুজুর মন্দির খালি দেখে চ্যাং এতক্ষণে নিশ্চয়ই তোমাকে ধরবার জন্যে চারিদিকে লোক পাঠিয়েচে। এখানে থাকলে তুমি বিপদে পড়বে!"

অমিয় বললে, "আর পালানো মিছে! ঐ দেখ, কারা এদিকে আসচে!"

সর্ব্বনাশ! সত্যিই তো, গাছের তলার পথ দিয়ে জন দশ-বারো লোক হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে আসছে—আমাদের দিকেই!

আমরা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম!

আগন্তুকদের সকলের আগে আগে আসছে কং হিং এবং তার

পিছনেই বিপুলবপু চ্যাং,—সমুদ্রের প্রবল বাতাসে তার সেই লম্বা গোঁফ-জোড়া ফর্‌ফর্‌ ক'রে দুদিকে উড়ছে !

কং হিং তার সদাহাস্যময় মুখে আরো বেশী হাসি ফুটিয়ে বললে, "আরে আরে, বীরুবাবু যে ! আরে আরে, সরুবাবু—অমিবাবুও যে ! তাহ'লে তোমরা বেঁচে-বর্ত্তে মনের সুখে আছ ? বেশ, বেশ ! আমি ভেবেছিলুম, এতদিনে তোমরা পাতালের ভূত হয়ে পেট ভ'রে জলপান করচ !"

বীরেনদা বললে, "আমরাও ভেবেছিলুম তোমাদের ঐ সুচেহারা এ-জন্মে আর দেখতে পাব না। তাহ'লে মানোয়ারি জাহাজের গোলা তোমাদেরও হজম করতে পারে নি ?"

—"না। বড়-জোর চণ্ডু কি গুলি খাওয়ার অভ্যাস আছে, ও গোলা-টোলা আমাদের ধাতে সহ্য হয় না।······আরে, তোমাদের সঙ্গে ওটি কে ? এই দ্বীপের রাণী বুঝি ? আমরা যে ওঁকেই খুজতে এখানে এসেচি—সেলাম, রাণী-সাহেবা !"

বীরেনদা বললে, "কেন, রাণীর কাছে তোমাদের কি দরকার ?"

—"বিশেষ কিছুই নয়। ওঁর কাছে খালি জানতে এসেচি, জুজুর ধনরত্ন উনি কোথায় সরিয়ে ফেলেচেন ?"

বিজয়া সিধে হ'য়ে দাঁড়িয়ে তেজ-ভরা গলায় বললে, "সে খোঁজে তোমাদের দরকার কি ?"

কং হিং খিল্‌-খিল্‌ ক'রে হেসে বললে, "দরকার একটু আছে বৈকি !"

—"আমি বলব না।"

—"রাণী-সাহেবা, একটু বুঝে-সুঝে কথা বলবেন। এই যে চ্যাং-ভায়াকে দেখচেন, একে চেনেন তো? এর মেজাজ বড় ভালো নয়। আস্তে আস্তে আমাদের সঙ্গে আসুন, ধনরত্নের জায়গাটা কোথায় দেখিয়ে দিন।—নইলে— -"

—"নইলে?"

—"নইলে আমরা আদর ক'রে আপনাকে ধ'রে নিয়ে যাব।"

—"আমি যাব না!"

চ্যাঙের দিকে ফিরে কং হিং মিনিট-খানেক চীনে-ভাষায় কি কথা কইলে।

চ্যাঙের কুৎসিত মুখের একটামাত্র চক্ষু দপ্‌ ক'রে হঠাৎ জ্ব'লে উঠল!—তাড়াতাড়ি সে বিজয়ার দিকে এগিয়ে এল।

কিন্তু বীরেনদাও তৈরি হয়েই ছিল—সে তখনি চ্যাং আর বিজয়ার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল এবং অত্যন্ত শান্ত ভাবে বললে, "আমাকে বধ না ক'রে তুমি বিজয়ার গা ছুঁতে পারবে না!"

কং হিং বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "ওকি বীরুবাবু, ওকি! আমাদের দলেরই লোক হয়ে তুমি সর্দ্দারকে বাধা দিতে চাও?"

অমিয় খাপ্পা হয়ে বললে, "কে তোমাদের দলের লোক? জোর ক'রে আমাদের হাতে নীলগোলাপের ছাপ মেরে দিয়েচ ব'লেই কি ভাবচ, আমরা তোমাদের গোলাম হয়ে থাকব?"

কং হিং হাসিমুখে বললে, "তোমরা বিদ্রোহী হ'লেও আমাদের কিছু ভয় নেই। এইখানেই আমাদের দলের আরো কত লোক আছে, তা দেখচ? দরকার হ'লে আরো লোক আসবে। তার ওপরে তোমরা

নিরস্ত্র। আমাদের সঙ্গে গোলমাল বাধালে বেশী সুবিধে করে' উঠতে পারবে কি?"

বীরেনদা দৃঢ়-স্বরে বললে, "আমাকে বধ না ক'রে কেউ বিজয়ার একগাছি চুলও ছুঁতে পারবে না!"

কাপড়ের ভিতর থেকে ফস্ ক'রে একখানা চক্‌চকে ছোরা বার ক'রে বিজয়া বললে, "আমাকে কেউ ছোঁবার আগে এই ছোরার কথা যেন ভুলে না যায়।" এই ব'লে সে ছোরাখানাকে বাগিয়ে ধ'রে এমন ভাবে রুখে দাঁড়াল, যে তার সেই মহিমময়ী তেজস্বিনী মূর্ত্তি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম। সে মূর্ত্তি বাঙালীর মেয়ের নয়,—বাংলাদেশে মানুষ হ'লে বিজয়া এমন বুকের-রক্ত-তাতানো অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করতে পারত না। হ্যাঁ, এই বিজয়া সিংহবাহিনীরই জাত বটে!

অমিয় নিজের বিপদের কথা ভুলে উল্লসিত কণ্ঠে গেয়ে উঠল—

তুমি বিজয়িনী নারী!
কখনো মধুর, কখনো ভীষণ—
তোমায় চিনিতে নারি!
নয়নে প্রলয়-মেলা,
মরণ খেলিছে খেলা,
ও-রূপ দেখিলে চরণের তলে
হাসিয়া মরিতে পারি!

কং হিংয়ের হাসি আরো মিষ্ট হয়ে উঠল। সে বললে, "ছোক্‌রা, তুমি গান থামাও। এখন গান শোনবার সময় নয়।......বীরুবাবু, চ্যাং বল্‌চে যে, তুমি দলের লোক ব'লেই সে এখনো সহ্য ক'রে আছে,

নইলে এতক্ষণে সে আছাড় মেরে তোমার দেহকে গুঁড়ো ক'রে দিত !"

বীরেনদা সহজ ভাবেই বললে, "বেশ তো, চ্যাং একবার সেই চেষ্টাই ক'রে দেখুক্ না !"

—"বল কি বীরুবাবু ! তুমি কি শোনোনি, চ্যাঙের গায়ে জোর কত ? চীনদেশে সে একজন বিখ্যাত পালোয়ান ব্যক্তি—জীবনে সে কখনো কোনদিন কারুর কাছে হারে নি !"

বীরেনদা হেসে বললে, "জীবনে আমার সঙ্গেও চ্যাং কোনদিন লড়াই করে নি ।"

—"তাহ'লে মরো।"—ব'লেই কং হিং চীনে-কথায় চ্যাংকে কি বললে।

বোধ হয় বীরেনদা তার সঙ্গে লড়তে চায় শুনেই চ্যাং আকাশের দিকে মুখ তুলে বিশ্রী ঝাঁঝ্রা গলায় তীব্র অট্টহাস্য করতে লাগল—তেমন ভয়ানক হাসি আমি আর কখনো শুনিনি !

বীরেনদা ঠাস্ ক'রে চ্যাঙের গালে এক চড় মেরে বললে, "তোমার ঐ বেসুরো হাসি আমার ভালো লাগচে না, শীগ্গির চুপ কর !"

চড় খেয়ে চ্যাঙের মুখের ভাব যে-রকম হ'ল, দেখলেই বুকের কাছটা শিউরে ওঠে ! তার সেই প্রায় সাত ফুট লম্বা দেহ যেন আরো উঁচু হয়ে উঠল এবং ভীষণ এক গর্জ্জন ক'রে সিংহের মতন সে বীরেনদার উপরে লাফিয়ে পড়ল !

সঁ্যাৎ ক'রে একপাশে স'রে যেতে যেতে বীরেনদা হুম্ ক'রে

চ্যাঙের পাছায় এক লাথি বসিয়ে দিলে এবং টাল্ সামলাতে না পেরে চ্যাং তখনি দড়াম ক'রে মাটির উপরে প'ড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বীরেনদা তার উপরে ঝাঁপিয়ে, সেই অবস্থায় তাকে দুইহাতে জড়িয়ে ধরলে।

চ্যাংও প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলে বীরেনদাকে! তারপরে সেই আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থাতেই দুজনে গড়াতে গড়াতে খানিক্ দূর চ'লে গেল!

বিজয়া কৌতুক-ভরে ব'লে উঠল, "বা বীরেন, চমৎকার, চমৎকার!

তারপর সে-যে বিষম মরণ-যুদ্ধ সুরু হ'ল, আমি তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না! চ্যাঙের গায়ে যে এমন আশ্চর্য্য শক্তি, আমিও তা কল্পনা করিনি! এতক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম, কিন্তু এখন আমার ভয় হ'তে লাগল, আজ বুঝি বীরেনদার মান ও প্রাণ দুইই একসঙ্গে নষ্ট হয়!

কখনো বীরেনদা চ্যাঙের উপরে, কখনো চ্যাং বীরেনদার উপরে এবং ধাক্কাধাক্কি ও আছ্ড়া-আছ্ড়ির সঙ্গে ঘুসি ও চড় সমান চলতে লাগল! বুঝলুম, চ্যাংও কুস্তি, যুযুৎসু ও 'বক্সিং' জানে! তার উপরে তার দেহও বীরেনদার চেয়ে লম্বায়-চওড়ায় দুয়েই বড়। হয়তো বীরেনদার গায়ের জোর বেশী, এতক্ষণ ধ'রে তাই সে গুরুভার চ্যাঙের সঙ্গে বুঝ্তে পারছে! আর বীরেনদার বয়সও চ্যাঙের চেয়ে অনেক কম, তাই তার দমও বোধ হয় বেশী!

রক্তে দুজনের সারা অঙ্গ ভেসে যাচ্ছে এবং তাদের দাপাদাপিতে

সমুদ্রতটের বালিগুলো উড়ছে যেন দম্‌কা ঝড়ের মুখে—আর ঘুসোঘুসি ও পরস্পরের গা-ঠোকাঠুকিতে শব্দ হ'চ্ছে যেন কাঠের উপরে কে খট্‌ খট্‌ ক'রে কাঠ ঠুকছে!

অমিয় অশ্রান্ত ভাবে ব'লে চলছে—"এইবার বীরেনদা! মারো এক ধোবী প্যাঁচ্‌! না, না,—কাঁচি মারো! চ্যাং কাঁধ নামিয়েচে—এইবেলা ওর চোয়ালে একটা 'নক্‌-আউট ব্লো' ঝাড়ো! সাবধান বীরেনদা, পিছিয়ে যেওনা—পিছনে একটা গর্ত্ত! আর ভয় নেই বীরেনদা, চ্যাং খুব হাঁপাচ্ছে—তুমি ওকে দমে মেরে দেবে" প্রভৃতি।

বিজয়া বলছে, "সাবাস বীরেন, সাবাস! চ্যাং এইবারে ব্যাং হ'ল ব'লে!"

ফিরে দেখলুম, চীনে-বোম্বেটেগুলো অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে মল্লযুদ্ধ দেখছে, কিন্তু কং হিং দাঁড়িয়ে আছে পাথরের পুতুলের মতন নিশ্চল হ'য়ে, এবং তার ঠোঁটে সেই সদাপ্রস্তুত হাসির লীলা!

এতক্ষণে আমার মনে আশা এল। সত্যি, চ্যাং বেজায় হাঁপাচ্ছে!

হঠাৎ চ্যাং আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল! তার সেই একটামাত্র চোখের উপরে গিয়ে পড়ল বীরেনদার এক বজ্র-মুষ্টি! ডানহাতে চোখটা চেপে ধ'রে সে তাড়াতাড়ি পিছনদিকে স'রে গেল!

কিন্তু বীরেনদা তাকে ছাড়লে না, এগিয়ে গিয়ে বিদ্যুৎ-বেগে সে উপর-উপরি আরো গোটাকয়েক ঘুসি বৃষ্টি করলে—অন্ধ চ্যাং প্রথমে হাঁটু গেড়ে ব'সে, তারপর শুয়ে প'ড়ে অত্যন্ত অসহায় ভাবে বিষম যন্ত্রণায় কুঁক্‌ড়ে কুঁক্‌ড়ে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল!

বীরেনদা মাতালের মতন টল্‌তে টল্‌তে ফিরে দাঁড়াল, হয়তো সেও

প'ড়ে যেত—কিন্তু বিজয়া ছুটে গিয়ে দুই হাতে তাকে আকুল ভাবে জড়িয়ে ধরলে!

কং হিং তিক্ত স্বরে হেসে উঠে, চীনে-ভাষায় চেঁচিয়ে কি বললে—সঙ্গে সঙ্গে আট-দশজন বোম্বেটের আট-দশটা বন্দুকের মুখ ফিরল, আমাদের দিকেই!

—সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো বন্দুকের আওয়াজ হ'ল এবং মনের ভিতর দিয়ে যেন মরণের একটা ঝড় ব'য়ে গেল!

—কিন্তু আমরা মরলুম না, মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল চার-পাঁচজন চীনে-বোম্বেটেই!

বিস্মিত ভাবে ফিরে দেখি, গাছের তলা থেকে পরে পরে মানোয়ারি গোরার দল বেরিয়ে, বেগে আমাদের দিকে ছুটে আসছে!

আবার কতগুলো বন্দুকের আওয়াজ! কং হিং আর বাকি বোম্বেটেগুলো হতাহত হয়ে মাটির উপরে আছ্‌ড়ে পড়ল।

জাহাজী কাপ্তেনের পোষাক-পরা এক সাহেব ছুটে এসে বীরেনদার দুই হাত ধ'রে ঝাঁকানি দিয়ে প্রশংসা-ভরা গলায় বললে, "আমরা লুকিয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখেচি! তুমি বীর!"

বীরেনদা শ্রান্ত হয়ে বালির উপরে ব'সে প'ড়ে বললে, "তোমরা আমাদের প্রাণ আর এই বীর-মহিলার মান বাঁচালে! ভগবান তোমাদের পাঠিয়েচেন। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ! এখন এর বেশী আর কিছু বলবার শক্তি আমার নেই!"

সাহেব বললে, "এই ভীষণ একচোখো বোম্বেটের জন্যে চীন-সমুদ্রে বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েচে। তাই সরকার এর দলকে দমন করবার জন্যে

এই মানোয়ারি জাহাজ পাঠিয়েচেন। আজ ক'দিন ধ'রে আমরা পিছনে পিছনে আছি, কিন্তু কিছুতেই এদের ধরতে পারি-নি। আজও হয়তো এই হল্‌দে সয়তানের বাচ্ছারা আমাদের চোখে ধূলো দিত, কেবল তোমাদের জন্যেই আজ একে বন্দী করতে পারলুম। তোমরাও আমার ধন্যবাদ নাও।"

ওদিকে চ্যাং আর একবার অনেক কষ্টে উঠে বসবার প্রাণপণ চেষ্টা করলে, কিন্তু একটু উঠেই আবার বালির উপরে মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়ে গেল!

কং হিং দুই হাতে ভর দিয়ে রক্তাক্ত দেহ নিয়ে উঠে বস্‌ল—তখনো তার সারা মুখ হাসছে আর হাস্‌ছে! তেমনি হাসতে হাসতেই সে বললে, "বীরুবাবু! তোমাদেরই জিৎ! তোমাদের বাঙালী জাতকে লোকে কাপুরুষ আর দুর্ব্বল বলে কেন? তোমরা বীর, তোমরা মরণের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আমার মতন হাসতে পারো, তোমরা দুর্দ্দান্ত চ্যাং আর তার দলকে কুপোকাৎ করলে! মরবার সময়ে আমি তোমাদের নমস্কার করচি—নমস্কার, নমস্কার!"—ব'লেই দু-হাত জোড় ক'রে কপালে ছুঁইয়ে সে আবার এলিয়ে প'ড়ে গেল—আর একটুও নড়্‌ল না!

কং হিংয়ের রহস্যময় হাস্য এ-পৃথিবীতে আর কেউ দেখতে পাবে না!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সব ভালো যার শেষ ভালো

আজ সকালের প্রথম সূর্য্যের আলোয় আকাশ আর পৃথিবী যখন অগাধ শান্তির হাসি হেসে উঠল, আমাদের নৌকাও তখন ডাঙা ছেড়ে সেই মানোয়ারি জাহাজের দিকে এগিয়ে চলল—কিছু দিন আগে যার ভয়ে আমরা এই অজানা দ্বীপে পালিয়ে এসেছিলুম!

পালিয়ে এসেছিলুম তিনজনে, কিন্তু ফেরবার সময়ে দলে একজন লোক বাড়ল। বোধ হয় বলতে হবে না যে, সে বিজয়া।

আমরা ছাড়া মানোয়ারি জাহাজেও আরো লোক বাড়ল। তারা সেই বোম্বেটের দল—গোরাদের বন্দুকের মুখ থেকে বেঁচে তারা চলেছে আজ ফাঁসীকাঠে ঝুলে মরবার জন্যে।

তারাও জুজুর ধনরত্ন পেলে না, আমরাও হাতে পেয়ে তা ছেড়ে দিলুম। কারণ বীরেনদা বললে, "জুজুকে মানি আর না মানি, তিনি এই দ্বীপের দেবতা। এই দেবতার জন্যে বোম্বেটেদের হাতে অনেক সরল, নিরীহ অসভ্য মানুষ প্রাণ দিয়েচে। তাদের রাণীকেও আমরা হরণ ক'রে নিয়ে চলেছি, এখন বেচারীদের দেবতারও গয়না চুরি করলে আমাদের পক্ষে মহাপাপ হবে!"

আমরাও বীরেনদার কথায় সায় দিলুম।

জাহাজ ছাড়ল।

ডেকের উপরে রেলিং ধ'রে বিজয়া দাঁড়িয়ে আছে—ছবির মতন স্তব্ধ হয়ে।……

নীলাকাশের তলায় সেই সবুজ দ্বীপটি যখন ক্রমেই ছোট হয়ে স্বপ্নের মতন মিলিয়ে গেল, তখন বিজয়ার চোখ দিয়ে ঝরতে লাগল অশ্রুবিন্দুর পর অশ্রুবিন্দু!

বীরেনদা সমবেদনা-ভরা কণ্ঠে বললে, "বিজয়া, তুমি কাঁদচ!"

হাত দিয়ে চোখের জল মুছে বিজয়া বললে, "একদিন দেশ ছেড়ে এখানে এসে অনেক কেঁদেছিলুম। কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন স্বদেশ ছেড়ে আবার বিদেশের দিকে চলেচি!"

আমি বললুম, "না বিজয়া, তুমি তো বিদেশে যাচ্ছ না! তোমার মনের স্বদেশ যে এখন ঐ বীরেনদার বুকের ভিতরেই!"

অমিয় বললে, "হায় রে হায়! এক যাত্রায় পৃথক ফল! বীরেনদা তো 'অ্যাডভেঞ্চার' করতে এসে নিজের কাজ দিব্যি গুছোলেন, কিন্তু আমাদের বুকের ভিতরটাকেও স্বদেশ ব'লে মনে করবার লোক তো পাওয়া গেল না! অদৃষ্ট!"

বিজয়া ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে বললে, "কেন, তোমাদের হিংসে হচ্ছে নাকি? তাহ'লে আগে বললেই তো হ'ত, আমার প্রজাদের ভিতরে কুমারী কন্যার অভাব ছিল না!"

অমিয় বললে, "মন্দ কথা নয়! বীরেনদা দেখবেন রাণীর চাঁদমুখ, আর আমাদের দগ্ধ ভাগ্যে জুট্‌বে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারের মতন দুঃস্বপ্ন! তোমার দয়াকে ধন্যবাদ দিচ্ছি বিজয়া!"

বিজয়া

বিজয়া বললে, "কেন ভাই অমিয়! আমি তো চিরদিনই তোমাদের বন্ধু হয়ে থাকব! আমার মতন বন্ধুর প্রেম কি তোমাদের কাছে একেবারেই নগণ্য?"

আমি বললুম, "বাপ্ রে, সে কথা কি মুখে উচ্চারণ করতে পারি? তোমার চক্‌চকে ছোরার কথা এখনো ভুলে যাইনি বন্ধু! তোমার প্রেম নগণ্য, এত-বড় কথা বলবার মতন বুকের পাটা আমাদের নেই!"

অমিয় গাইলে :—

বন্ধু! তোমায় বরণ করি!
কোন্ গগনের চাঁদ ছিলে ভাই,
পড়্‌লে ধরার ধূলায় ঝরি।

* * *

সাত-সাগরে দিয়ে পাড়ি
এসেছিলেম তোমার বাড়ী,
আর কি গো সই, তোমায় ছাড়ি,
রইব এখন চরণ ধরি—
বন্ধু! তোমায় আপন করি!

* * *

চক্ষে তোমার রূপের স্বপন,
বক্ষে আদর-নীড়,
কণ্ঠ তোমার ছন্দ-গানের
চল্‌চে টেনে মীড়!

বিজয়া

তোমার সাথে মেলা-মেশা,
এ যেন এক কিসের নেশা !
আমার যে ভাই প্রেমের পেশা,
তুমি যে ভাই প্রেমের পরী,—
বন্ধু ! তোমায় প্রণাম করি !